ভারতের সংসদে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেশদ্রোহের নামান্তর
—পৃঃ ১৭

স্বস্তিকা

দাম : বারো টাকা

মাননীয়া আপনার রাজনৈতিক বেলুন ফুটো হইয়া গিয়াছে
—পৃঃ ২৪

৭১ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা।। ৮ জুলাই ২০১৯।। ২২ আষাঢ় - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com



স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা, ২২ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

৮ জুলাই - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

নুসরত, জায়রিরা তুল ধরলেন অসহিষ্ণু ভারতবর্ষের ছবিটা ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

খোলা চিঠি : কাটমানি খেতে চান? মেনে চলুন তিন পথ ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

উচ্চ হারে বৃদ্ধি ও চাকরির বাজার বাড়াতে গেলে বিপুল রপ্তানিই একমাত্র রাস্তা ▯ অরবিন্দ পানাগড়িয়া ▯ ৮

আমাদের নির্বাচনী গণতন্ত্রের সংকট এখনো কাটেনি ▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১১

এক দেশ এক নির্বাচন ব্যবস্থায় সমৃদ্ধ হবে দেশ ▯ আর কে দে ▯ ১৩

ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতই নেতৃত্ব দিতে পারে ▯ ডা. আর এন দাস ▯ ১৫

ভারতের সংসদে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেশদ্রোহের নামান্তর ▯ দেবযানী ভট্টাচার্য ▯ ১৭

দেশাত্মবোধে 'বন্দে মাতরম্' এবং দেশধর্মে 'জয়শ্রীরাম' ▯ বিরূপেশ দাস ▯ ২০

রুই কাতলারা সাধু আঁশবঁটিতে চুনোপুঁটিরা ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ২৩

মাননীয়া আপনার রাজনৈতিক বেলুন ফুটো হইয়া গিয়াছে ▯ সুজিত রায় ▯ ২৪

পচন তো ধরেছে মাথাতেই ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ২৬

বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে ভরতনাট্যম্ নৃত্যশৈলী ▯ ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩১

পরিবেশ রক্ষায় হিন্দু দর্শন ▯ শুভেন্দু সরকার ▯ ৩২

হিন্দু মহাকাব্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবটের উল্লেখ ▯ সৌমেন নিয়োগী ▯ ৩৩

ধর্মরক্ষার্থে আত্মঘাতী হন জমিদার চিত্তরঞ্জন ▯ শুভদীপ গাঙ্গুলী ▯ ৩৫

তোলাবাজিতে বামেদেরও হারিয়ে দিয়েছে তৃণমূল ▯ ধীরেন দেবনাথ ▯ ৪২

ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কিছু অসঙ্গতি ▯ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ▯ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ চিঠিপত্র : ১৯ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০ ▯ নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ ▯ অন্যরকম : ৪০ ▯ খেলা : ৪১▯ কৃষিকথা : ৪৫ ▯ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৮ ▯ স্মরণে : ৪৯ ▯ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

প্রকাশিত হবে
১৫ জুলাই
২০১৯

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যা

প্রকাশিত হবে
১৫ জুলাই
২০১৯

সংবিধানের ৩৭০ ধারার উচ্ছেদ

সম্প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সংবিধানের ৩৭০ ধারা উচ্ছেদ করার পক্ষে সওয়াল করেছেন। তাঁর যুক্তি, ৩৭০ ধারা একটি সাময়িক ব্যবস্থাপত্র। যার কোনো প্রাসঙ্গিকতা এখন আর নেই। জবাবে ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুক আবদুল্লা বলেছেন, ৩৭০ ধারা যদি সাময়িক ব্যবস্থাপত্র হয়, তাহলে কাশ্মীরের ভারত-অন্তর্ভুক্তিও সাময়িক। ৩৭০ ধারা না থাকলে কাশ্মীরও ভারতে থাকবে না। অর্থাৎ, ফারুক আবদুল্লা প্রকারান্তরে বলতে চাইছেন, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ শুধুমাত্র ৩৭০ ধারা থাকার কারণে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা উচ্ছেদ।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata**

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার



SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বুমেরাং হইবে না তো

রাজ্য-রাজনীতিতে এখন বহুল আলোচিত বিষয়টির নাম 'কাটমানি।' বলিতে গেলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া বর্তমান রাজনৈতিক বিতর্কটির সূত্রপাত ঘটাইয়াছেন। নির্বাচন কৌশলী প্রশান্ত কিশোরের সঙ্গে বৈঠকের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাঁহার দলের যেইসব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং নেতৃবৃন্দ 'কাটমানি' খাইয়াছেন, তাহাদের কাটমানির অর্থ ফিরত দিতে হইবে। অন্যথায় মুখ্যমন্ত্রী তাহাদের বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। শুনা যাইতেছে, নির্বাচন কৌশলী প্রশান্ত কিশোরের পরামর্শক্রমেই মমতা এইরূপ ঘোষণাটি করিয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের তাগিদেই নাকি প্রশান্ত কিশোর এইরূপ একটি ঘোষণা করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। প্রশান্ত কিশোর কী পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। তবে ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, নিজের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তিকে কালিমা মুক্ত করিতেই ক্ষমতায় আসিবার আটবৎসর পর হঠাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাটমানি ফিরত দিবার কথা বলিতেছেন। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির নিকট হইতে একটি বিশাল ধাক্কা খাইয়া, মমতার এখন বোধোদয় হইয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিতেছেন, ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে তাঁহার বিদায় সমাসন্ন। এবং ইহাও বুঝিতে পারিতেছেন, তাঁহার দলের নেতা-মন্ত্রীগণের সীমাহীন দৌরাত্ম্য এবং দুর্নীতিই তাঁহাকে এবং তাঁহার দলটিকে খাদের কিনারায় আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। এই অবস্থায় নিজেকে বাঁচাইবার তাগিদ অনুভব করিতেছেন তৃণমূল নেত্রী।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কাটমানি ফিরত দিবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার পিছনে কতটা আন্তরিকতা আছে তাহা সংশয় ও সন্দেহের বিষয়। কাটমানি ফিরত দিবার এই ঘোষণাটি করা সম্পূর্ণত একটি রাজনৈতিক কৌশল। সমস্ত অভিযোগ দলের মাঝারি এবং ছোটো নেতাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া নিজে সাধু সাজিবার একটি প্রয়াস। মমতা ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন, তাঁহার দলে অন্য সকলে অসাধু হইলেও তিনিই একমাত্র সৎ ব্যক্তিত্ব। এই প্রচারটিই যে তাঁহার লক্ষ্য, সেইটি বুঝা যাইতেছে বাজনদারদের এবম্বিধ প্রচারে। কিন্তু যতই কৌশল করিয়া মমতা এই কাটমানির চালটি দিয়া থাকুন না কেন, বাস্তবে তাহা কতখানি কাজ করিবে—সেই বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াই যাইতেছে। বরং এই সংশয়ই দেখা দিতেছে যে, মমতার এই কৌশল শেষ পর্যন্ত বুমেরাং হইয়া তাঁহারই নিকট ফিরিবে না তো?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাটমানি ফিরত দিবার কথা ঘোষণা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই জিলায় জিলায় তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের বাড়িতে সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ দেখাইতে শুরু করিয়াছে। সর্বত্রই একই রব—কাটমানি ফিরত দাও। ইহার ফলে দলে মাঝারি এবং ছোটো নেতারা বিপদে পড়িয়াছেন। মূষল পর্বের মতো পরিস্থিতি উপস্থিত হইয়াছে দলে। কিন্তু ইহারই সঙ্গে এই প্রশ্নও দলের অন্দরে এবং বাহিরে উঠিতেছে যে, রাঘব-বোয়ালদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী কোনোরূপ ব্যবস্থা লইতেছেন না কেন? আসলে, রাঘব বোয়ালদের আড়াল করিবার জন্যই অন্য দিকে দৃষ্টি ঘুরাইবার ইহা একটি প্রয়াস নয়তো।

কাঁচের ঘরে বসিয়া মুখ্যমন্ত্রী ঢিল ছুঁড়িয়াছেন। পাল্টা আঘাতে তাঁহার কাঁচের ঘরটি চূর্ণ হইয়া যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। তৎসত্ত্বেও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী যিনি প্রকাশ্যে মানিয়া লইয়াছেন, তাঁহার দলটি দুর্নীতিবাজদের আখড়া হইয়া উঠিয়াছে।

সুভাষিতম্

যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবং পরিষেবতে।

ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি চাধ্রুবং নষ্টমেব চ।। (চাণক্য নীতি)

যে নিশ্চিতকে ছেড়ে অনিশ্চিতকে আঁকড়ে ধরে, তার নিশ্চিতও নষ্ট হয় আর অনিশ্চিত তো নিজেই নষ্ট হয়ে যায়

নুসরত, জায়রিরা তুলে ধরলেন অসহিষ্ণু ভারতবর্ষের ছবিটা

প্রায় একই সময়ে দুটি ঘটনা সমাজে তোলপাড় ফেলেছে। একটি হলো, অভিনেত্রী তথা সদ্য-নির্বাচিত সাংসদ নুসরত জাহান তাঁর 'অইসলামিক' আচরণের জন্য দেওবন্দ সহ মুসলমান মৌলবি সমাজের চক্ষুশূল হয়েছেন; দ্বিতীয়ত, দঙ্গলখ্যাত অভিনেত্রী জায়রা ওয়াসিম তাঁর সম্ভাবনাময় অভিনেত্রী জীবনে ছেদ টেনে দিলেন, স্রেফ 'ধর্মীয়' কারণে। গোঁড়া মুসলমান সমাজের হাতে ভারতবর্ষের নারীরা স্বাধীনতার আগে থেকেই লাঞ্ছিত, নিগৃহীত হয়ে আসছেন। আজও 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।' তবুও নুসরত-জায়রার ঘটনা আবারও আমাদের সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিচ্ছে যে, বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের কোন ধর্মীয় চরিত্র ফুটে উঠছে? জেহাদি সংস্রবে তাসখন্দের বুকে ভারতবর্ষে কর্মপ্রক্রিয়া চালানোর জন্য যে মতধারার দলের উৎপত্তি হয়েছিল, সেই দল আর পরবর্তীকালে তার থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা দলের সলিল সমাধি ঘটলেও, সেই দেশদ্রোহী মতবাদের জীবাশ্ম এখনও রয়ে গিয়েছে। বলা বাহুল্য, সেই কমিউনিস্ট মতবাদ বহু যুগ ধরে সারা বিশ্বের সামনে মার্কস- লেনিনীয় ঐতিহ্য মেনে ভারতবর্ষকে হেয় করতে বদ্ধপরিকর এবং তাদেরই সাম্প্রতিক অ্যাজেন্ডা 'হিন্দু মৌলবাদ', 'হিন্দু-ফ্যাসিজম', 'হিন্দু-সন্ত্রাসবাদ' ইত্যাদি শব্দ-বন্ধনী সৃষ্টি করা এবং আর এস এস বিজেপি ভারতবর্ষকে কতটা 'ভয়ংকর' পথে নিয়ে যাচ্ছে তা প্রতিপন্ন করে বিদেশি শক্তির দালালরূপে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করা।

নুসরত-জায়রার ঘটনা যদিও এর বিপরীত সত্যিটিকেই উন্মোচিত করে যে এখনও ভারতবর্ষে মুসলমান মৌলবাদের হাত কতটা প্রসারিত, যে মৌলবাদ ভারতবর্ষকে ধর্মের ভিত্তিতে ত্রিখণ্ডিতই করেনি, টুকরো গোষ্ঠীর সৌজন্যে ভারতবর্ষকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করার নেশায় এখন মশগুল। এই মৌলবাদকে কমিউনিস্টরা ভারতের খণ্ডিত স্বাধীনতার আগে থেকেই তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সমর্থন জুগিয়েছে। এখনও সেই মৌলবাদকে একদিকে আড়াল ও অন্যদিকে প্ররোচিত করতে 'হিন্দু মৌলবাদ' বা 'প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা' ইত্যাদি গল্প আমদানি করে। কারণ হিন্দুদের নিবীর্য করে ভারতবর্ষের পূর্ব-পশ্চিমপ্রান্তে দু'টি মুসলমান সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনের জন্য তাদের অবদানই সবচেয়ে বেশি, আর দুই মুসলমানি রাষ্ট্রকে চীনের মদত দিয়ে ভারতবর্ষকে শত্রু পরিবেষ্টিত করে রেখে তার রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ

বিশ্বামিত্র-র কলম

নেওয়া, নেহরুর প্রভাবে কমিউনিস্টরা তাদের ভারত-বিরোধী যাবতীয় ষড়যন্ত্র সফল করতে পেরেছিল।

মুসলমান চরিত্রের একটি বিশিষ্টতা রয়েছে। দেখবেন যেসব অমুসলমান দেশে তারা শক্তিশালী, অন্তত রাজনৈতিক শক্তির নিরিখে, সেইসব জায়গায় তারা আরবি ফতোয়া, শরিয়তী আইন এসব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, মূল লক্ষ্য অবিলম্বে দেশটিকে মুসলমান দেশে পরিণত করা। যেমন ভারত। অন্যদিকে দেখুন যেখানে মুসলমানরা রাজনৈতিক ভাবে দুর্বল সেখানে তারা সেদেশেরই আইন-কানুন মেনে চলে, যেমন চীন বা অস্ট্রেলিয়া। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অস্তিত্ব না থাকলে এতদিনে ভারতে নিশ্চিতভাবেই শরিয়তিবিধি লাগু হতো। স্বাধীন ভারতবর্ষ, মসনদে সুদীর্ঘকালের তমসা কাটিয়ে একটি জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন রাজনৈতিক দলের একচ্ছত্র আধিপত্য তারপরেও এক মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত নায়িকাকে হিন্দু ছেলে বিয়ে করার 'অপরাধে' 'বন্দে মাতরম্' স্লোগান দেওয়ার মতো মুসলমান সমাজের পক্ষে 'গর্হিত' কাজের দায়ে মৌলবাদীদের হুমকি শুনতে হচ্ছে, আর এক নায়িকা তো হালই ছেড়ে দিলেন, এমনই যে সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ার ছেড়ে মৌলবাদের কাছে, মৌলবাদীদের কাছে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হলো।

প্রথমজন অর্থাৎ নুসরত জাহান, ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর সম্পর্কে আমাদের বলার কিছুই নেই। পার্কস্ট্রিট ধর্ষণ কাণ্ডে তাঁর প্রেমিকাকে আড়াল করার অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু মৌলবাদের মুখোশটা তিনি নির্মমভাবে খুলে দিয়েছেন, এটা মানতেই হবে। ভোটপর্বে তিন তালাকের বিরুদ্ধে কথা বলায় তাঁর দলনেত্রী 'ও বাচ্চা মেয়ে' বলে নুসরতের কথা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিন তালাকের পক্ষে তাঁর দল আগেও ছিল। এখন দেওবন্দের ফতোয়ার পাশাপাশি দলের তরফে ইদ্রিস আলি যেভাবে দলনেত্রীর পরোক্ষ মদতে নুসরতকে একুল-ওকুল দুই যাবে বলে হুমকি দিচ্ছেন তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় এ রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস দল আর তাদের দলনেত্রীকে 'মুসলমান তোষণকারী' বললে বিষয়টা লঘু হয়ে যাবে, এদের 'ইসলামিক মৌলবাদের মদতদাতা' বললেই তা যথার্থ হবে।

এই দলে এখন কবীর সুমনের মতো ধর্মান্তরিত ধর্মান্ধ মৌলবাদী, বাঙ্গালি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের রমরমা; এই ইসলামপন্থী দলটির হাতে আর কিছুদিন রাজ্যের ক্ষমতা থাকলে তা দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিশ্চতভাবেই বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। নুসরত জাহান জৈন তা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

অন্যদিকে জায়রি ওয়াসিম দু-আড়াই বছর আগে তাঁর বিখ্যাত দঙ্গল ছবিটিতে অভিনয় করা থেকে মৌলবাদীদের টার্গেট, পরে মেহবুবা মুফতির তাঁকে 'কাশ্মীরি রোল মডেল' ইত্যাদি বলা নিয়ে মৌলবাদীদের আরেক প্রস্থ হাঙ্গামা, শেষে সম্প্রতি তাঁর অভিনয় ছাড়ার সিদ্ধান্তে বোঝা গেল মৌলবাদীদের চাপ আর তিনি নিতে পারলেন না। কমিউনিস্ট বন্ধুদের থেকে ভাষা ধার করে এবার সত্যি বলতে ইচ্ছে করছে নুসরত, জায়রিরা অসহিষ্ণু ভারতের ছবিটা চিনিয়ে দিয়ে গেলেন। সঙ্গে বামপন্থীদের মুখে তালা বিনামূল্যে পরিয়ে দিয়েও গেলেন। মুসলমান মৌলবাদের ব্যাপারে যাঁদের সহিষ্ণুতা এমন অসহিষ্ণুতার বিশ্বে দুর্লভই বটে। ■

কাটমানি খেতে চান? মেনে চলুন তিন পথ

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

ভাবছেন আপনাদের কাটমানি খাওয়ানোর ফায়দা শেখাতে এই চিঠি? মোটেও তা নয়। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসভায় যে ভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এতদিন ধরে তার নমুনা দিতেই এই চিঠি। দিদি তাঁর ভাইদের প্রকল্পের পর প্রকল্পে টাকা তোলার সুবিধা করে দিয়েছেন। এখন নতুন ভাই প্রশান্ত কিশোরের পরামর্শে সেই টাকা ফেরত দিতে বলছেন। আর তাতেই যত শোরগোল। বিজেপি আসছে বুঝতে পেরে ভয়ের ঠেলাতেই এখন শুদ্ধিকরণের কথা বলছেন দিদিমণি। কিন্তু দিদি যে নিজেই রাস্তা দেখিয়েছেন।

দিদি আজ নীতির কথা বলেছেন কিন্তু সবার আগে নীতি ভেঙেছেন তিনি নিজে। শহরের গরিব মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের 'হাউজিং ফর অল' প্রকল্প চালু হয়, ২০২২ সালের মধ্যে দেশে সব পরিবারের নিজস্ব বাড়ির লক্ষ্য নিয়েই এই প্রকল্প চালু করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রথমেই দিদি কেন্দ্রের সেই প্রকল্পের নাম বদলে দিয়ে অনৈতিক কাজ করেছেন। এই প্রকল্পে অর্ধেকের বেশি টাকা রাজ্য সরকারকে দিতে হওয়ার যুক্তিতে রাজ্য এর নাম বদলে দেয় 'বাঙ্গলার বাড়ি'। ঠিক যেমন ভাবে কেন্দ্রের 'স্বচ্ছ ভারত' প্রকল্প এই রাজ্যে নাম বদলে 'নির্মল বাংলা' হয়ে গেছে।

শহরাঞ্চলে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে উপভোক্তা প্রতি ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এর মধ্যে কেন্দ্র দেয় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং রাজ্যের তরফে দেওয়া হয় ১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা। এই প্রকল্পে ২৫ হাজার টাকা দিতে হয় উপভোক্তাকে। ৩৪০ বর্গফুটের বাড়ি তৈরির জন্য টাকা দেওয়া হয়। নিজস্ব বা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জমি থাকা বাধ্যতামূলক। এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য কোনও আয়ের সার্টিফিকেট লাগে না। টাকা দেওয়া হয় মোট চার পর্বে। ভিত তৈরি, লিন্টন ঢালাই, ছাদ ঢালাই এবং বাড়ি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে টাকা দেওয়া হয় অ্যাকাউন্টে।

সরাসরি সুবিধাভোগীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকলেও এর মধ্যেই কাটমানি দেওয়া নেওয়ার কায়দা আছে। তিন পথের সন্ধান দিয়েছে এক সংবাদমাধ্যম। সব রাজনৈতিক দাদা লেখাকে পড়ুন তৃণমূল নেতা।

পথ–১: কাটমানি নেওয়ার জন্য সব থেকে সফট টার্গেট অসচেতন গ্রাহক। সাধারণত সেই সব গরিব মানুষ, যাঁরা বিশ্বাসই করতে পারেন না যে, কোনও কিছু না দিয়ে কোনও কিছু আদৌ পাওয়া যেতে পারে। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অসচেতন মানুষের থেকে পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে উল্টে টাকা নেওয়া যায় খুব সহজে। টাকার পরিমাণ খুব বেশি না হলেও তাঁরা টাকা দেন। অল্প অল্প করে অনেকের থেকে পাওয়া টাকার অঙ্ক আর কম থাকে না।

পথ–২ : আর্থিক ভাবে খুব গরিব মানুষেরা সুবিধা পেতেই কাটমানি দেন। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরাসরি টাকা দেওয়ার মতো ক্ষমতা থাকে না তাঁদের। প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী বাড়ির ভিত তৈরির পরে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকে। পারিবারিক সূত্রে পৌনে এক কাঠা জমি থাকলেই মিলবে প্রকল্পের সুযোগ। কিন্তু ভিত গড়ার জন্য প্রায় ৭০ হাজার টাকা শুরুতেই খরচ করার ক্ষমতা সবার থাকে না। এই কাজটা প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা বিনা বিনিয়োগে করতে চাইলে এগিয়ে আসেন রাজনৈতিক দাদারা। তাঁরা ঠিক করে দেন নিজস্ব ঠিকাদার। সেই ঠিকাদারের বিনিয়োগে উঠতে থাকে বাড়ি। দফায় দফায় টাকা আসে গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে। সেই টাকা ঠিকাদার পেয়ে ভাগ দেন মধ্যস্থতাকারী রাজনৈতিক দাদাকে। যিনি গোটাটাই দেখাশোনা করেন যত্ন ও দায়িত্ব নিয়ে। এখানে সুবিধাভোগী সরাসরি টাকা না দিলেও ঠিকাদার বাড়ি তৈরিতে নিম্নমানের ইঁট, বালি, সিমেন্ট ব্যবহার করে লাভ বাড়ায় ও কাটমানি দেয়। পরোক্ষে যেটা সুবিধাভোগীরাই দিতে বাধ্য হয়।

পথ–৩ : এই পর্যায়ের কাটমানি আসে সুবিধাভোগীর পক্ষ থেকে সরাসরি এবং অর্থের পরিমাণও বেশি। এটা দিয়ে থাকেন তাঁরাই, যাঁদের নিজস্ব বাড়ি ছাড়াও জমি রয়েছে। 'বাংলার বাড়ি' বা 'হাউস ফর অল' কোনও প্রকল্পেই তাঁদের বাড়ি তৈরির টাকা পাওয়ার কথা নয়, আবার পেতে বাধাও নেই। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা রাজনৈতিক দাদা চাইলেই তিনি পেয়ে যেতে পারেন সরকারি ভরতুকি। আর সেটা পেতে কিছু খরচ করতে পিছপা হন না এই ধরনের সুবিধাভোগীরা। গৃহহীনদের বাড়ি বানাতে যে টাকা প্রাপ্য সেটা কিছু কাটমানি দিয়ে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বাড়ি বানিয়ে নেন অনেকেই। সেই বাড়ি এমন ভাবে প্ল্যান করা হয় যাতে সরকারি টাকা আসা পর্যন্ত সেটা ৩৪০ বর্গফুটের। পরে সেটাই অট্টালিকা হয়ে গেলে নিয়ম অনুযায়ী কিছুই বলার থাকে না।

এসব নাকি দিদি জানতেনই না। এটাও নাকি তিনি জানেন না যে এই কাটমানির টাকা তাঁর বাড়িতেও ঢোকে। নীচের তলার কর্মীদের সায়েস্তা করছেন কিন্তু উপরতলার রাঘববোয়ালরা পার পেয়ে যাচ্ছেন।

দিদিভাই, প্রশান্ত কিশোর যদি বলেন তবে ভাইপোর কাটমানি নিয়ে তদন্ত চালু করবেন নাকি!

—**সুন্দর মৌলিক**

উচ্চ হারে বৃদ্ধি ও চাকরির বাজার বাড়াতে গেলে বিপুল রপ্তানিই একমাত্র রাস্তা

অতিথি কলম



অরবিন্দ পানাগড়িয়া

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রপ্তানি বৃদ্ধিকেই অন্যতম গুরুত্বের অ্যাজেন্ডা করেছেন। একেবারে নির্ভুল সিদ্ধান্ত। ভারত যদি রপ্তানি ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বেশি মনোনিবেশ করে এবং তাকে সর্বশক্তি দিয়ে বৃদ্ধির রাস্তায় নিয়ে যেতে পারে তা 'চমৎকার' ঘটাতে পারে। বিশ্বে কোনো দেশই রপ্তানি বাণিজ্যে সাফল্য ছাড়া দুই বা তার বেশি দশক ধরে ৯ থেকে ১০ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির হার ধরে রাখতে পারেনি। বিশ্বে বাণিজ্যের অংশীদার হিসেবে ১৯৯১ সালে চীনের রপ্তানির অংশ ছিল ২ শতাংশ, ২০১২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১২.৪ শতাংশে। উল্লেখিত দুই দশকের মধ্যে চীন মূলত একটি কৃষিপ্রধান অর্থনীতি থেকে একটি আধুনিক শিল্পোন্নত অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের অংশগ্রহণের পরিমাণ মোট বাণিজ্যের মাত্র ১.৭ শতাংশ। ২০০০ সালে চীনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ যখন ৪ শতাংশে পৌঁছেছিল তখনই তার জিডিপি কিন্তু আজকের ভারতের জিডিপির হারের সমান ছিল। দীর্ঘস্থায়ী বৃদ্ধি ও ভালো চাকরির সৃষ্টি করতে গেলে রপ্তানি বৃদ্ধিকে মূল ফোকাস করে রপ্তানি-বান্ধব প্রশাসন ও প্রকল্পে উন্নতি ও বৃদ্ধি ঘটানো দরকার।

রপ্তানি বৃদ্ধির নীতি ও সঠিক কৌশল নিতে গেলে আমাদের দেশে চালু থাকা তিনটি বদ্ধমূল ধারণাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। এগুলি হলো— (১) আমদানি বাণিজ্য কমিয়ে ফেলা (Import substitution), মাইক্রো ও স্মল উদ্যোগে বৃদ্ধি (MSME) ও টাকার বিনিময় হারকে উচ্চ পর্যায়ে রাখা (strong super)। আমদানি বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে বিশ্বে কোনো দেশেই বিশাল ও দীর্ঘস্থায়ী বৃদ্ধি ঘটার প্রমাণ নেই।

ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র শিল্পদ্যোগগুলি কেবলমাত্র অল্প বেতনের কিছু উপার্জনেরই ব্যবস্থা করতে পারে। সেখানে উৎপাদনশীলতাও থাকে অত্যন্ত কম। এই ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলির সংলগ্ন যদি কোনো সফল বড়ো আকারের শিল্পোদ্যোগ না থাকে সেক্ষেত্রে এরা কোনোদিনই উচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জন বা কর্মীদের সমৃদ্ধ জীবনযাপনের উপযোগী বেতন দিতে পারবে না। টাকার বিনিময় হার বেশি থাকলে অর্থাৎ উদাহরণ স্বরূপ ১ ডলার= ৬৫ টাকা না হয়ে যদি ৬০ টাকা রাখার চেষ্টা হয় সেক্ষেত্রে আমদানি করা জিনিসের দাম কৃত্রিমভাবে সস্তা হবে। অন্যদিকে রপ্তানি করে তুলনামূলকভাবে কম টাকা আয় হবে। বিদেশি রপ্তানিকারীদেরও পড়তায় টান পড়বে। টাকার দাম কম থাকলে ১ ডলারের মাল পাঠিয়ে আগে ৬৫ টাকার জায়গায় এখন ৬০ টাকা পাবে। আমদানি-রপ্তানির এই বৈষম্যের ফলে বাণিজ্য ঘাটতি বাড়বে (সস্তা আমদানি বেশি হবে, রপ্তানির বিনিময়ে আয় কম হবে)। সরকার প্রতিকার হিসেবে তড়িঘড়ি আমদানির ওপর নানা শুল্ক চাপাতে শুরু করবে।

> "আলোচনার পরিসরে বলা প্রয়োজন যে রপ্তানি বাণিজ্যে বৃদ্ধি ঘটাতে গেলে বড়ো ও মাঝারি শিল্প বাড়তে পারে এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি করতেই হবে। এর জন্য প্রথমেই দরকার সহজলভ্য (আইনি মারপ্যাঁচ ও আন্দোলন ছাড়া) জমি ও সুসংহত শ্রম বাজার।"

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে সুস্থ পরিকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে তাই সর্বাগ্রে টাকার বিনিময় হারকে বাস্তবোচিত (বিশ্বের হারের নিরিখে) করা দরকার। এ প্রসঙ্গে দু'হাজার দশকটি সেরা উদাহরণ। ১৯৯০-৯১ সালে ১৭ টাকা ১ পয়সা প্রতি ডলারের দামকে কোনোভাবে সরকার নিয়ন্ত্রণ না করায় প্রতিযোগিতার বাজারে ২০০১-০২ সালে তা ৪৭ টাকা ৭ পয়সায় পৌঁছয়। অর্থাৎ অর্থনীতির ভাষায় টাকার অবমূল্যায়ন বা depreciation হলো (১৭ টাকার জিনিসের ৪৭ টাকা দাম হলো)। কিন্তু আমাদের এখানের উৎপাদকরা তাদের পণ্যের রপ্তানির এক সুবর্ণ সুযোগ পেল বিশ্ব বাজারের প্রতিযোগিতায়। অন্যদিকে যারা আমদানিকৃত পণ্যের সঙ্গে লড়াই করছিলেন তারাও এই মুক্ত অর্থনীতির সুযোগ পেলেন। টাকার দাম কমায় আমদানিকৃত মালের বিনিময়ে বেশি টাকা দিতে হলো।

পরবর্তী দশকে লক্ষণীয়ভাবে আমাদের রপ্তানিতে বিপুল বৃদ্ধি ঘটল। ২০০১-০২ অর্থবর্ষে রপ্তানি জিডিপি-র ১২.৯ শতাংশ থেকে ২০১১-১২ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ২৪.১ শতাংশে। এই ভাবে অতি দ্রুত বৃদ্ধির রপ্তানির বিপরীতে আমরা প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানিও দরাজ হাতে বাড়িয়ে

একই সময়সীমায় জিডিপির ১৪.৭ থেকে ৩০.৮ শতাংশে পৌঁছতে পেরেছিলাম। মনে পড়বে এই সেই সময় যখন ভারতে সেল ফোন বিপ্লব ঘটেছিল। আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যে লাগাতার বৃদ্ধি না ঘটলে আমরা বিপুল পরিমাণ সেল ফোনের আমদানি খরচ মেটাতে পারতাম না। ফলে এই যুগান্তকারী পরিবর্তন মাঝ রাস্তায় থমকে যেত।

২০১৪ সাল থেকে টাকার আন্তর্জাতিক বিনিময় মূল্যে সামান্য কিছু depreciation হওয়ায় আমাদের প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় আমাদের রপ্তানি পণ্যের দাম প্রায় ১৫ শতাংশ বেশি হয়ে থাকছে। সাম্প্রতিক একটি মূল্যবান গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিযোগিতার বাজারে এই ভাবে পিছিয়ে থাকার ফলে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য হ্রাস পেয়েছে। আগামীদিনে মার্কিন-চীন বাণিজ্যিক রেষারেষির কারণে চীনের ইয়ুনের দাম যদি কমে আর আমরা strong rupee নীতি নিয়ে চলি তাহলে কিন্তু বিশ্ব বাণিজ্যে আমাদের দেশ রপ্তানি প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে।

দ্বিতীয়ত, বাণিজ্য ক্ষেত্রের উদারীকরণ অর্থাৎ বিশ্ব বাণিজ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা জরুরি। হঠাৎ হঠাৎ anti dumping tax (আমদানি পণ্যের ওপর শুল্ক চাপানো) বাড়িয়ে দিয়ে সাময়িকভাবে দেশের মধ্যে ওই ধরনের পণ্যের উৎপাদকদের হয়তো সাময়িক উপকার হতে পারে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি ভাবে তা অর্থনীতির ক্ষতিই করে। কেননা সস্তায় আমদানি করা জিনিসের চেয়ে দেশের অভ্যন্তরে বেশি দামে তৈরি বস্তু মানুষকে কিনতে হয়। চড়া শুল্ক ও অ্যান্টি ডাম্পিং রুখতে অন্যান্য কর চাপানোর ফলে যখন আমদানি কমতে থাকে, সেই সময় আর বি আই টাকার দামকে বাড়তে দেয়। এর ফলে আমাদের রপ্তানি পণ্যের দাম বিশ্ব বাজারে বেড়ে যায়। রপ্তানি মার খায়।

কী আমদানি কী রপ্তানি উভয়ক্ষেত্রেই সরকারকে বাণিজ্যিক পরিকাঠামোর সরলীকরণ করে রাখা দরকার। অপ্রয়োজনীয় ছাড়পত্র নেওয়া, বন্দরে মাল পড়ে থেকে অহেতুক দেরি ও পরিবহণ খরচে বৃদ্ধি রপ্তানি পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। মোদী সরকারের অনুসৃত 'ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্যের নিরিখে ভারত এখনও নীচের দিকে বিশেষ করে সীমান্তবর্তী দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। এর থেকেই আমদানি-রপ্তানির সূত্রে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

আলোচনার পরিসরে বলা প্রয়োজন যে রপ্তানি বাণিজ্যে বৃদ্ধি ঘটাতে গেলে বড়ো ও মাঝারি শিল্প বাড়তে পারে এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি করতেই হবে। এর জন্য প্রথমেই দরকার সহজলভ্য (আইনি মারপ্যাঁচ ও আন্দোলন ছাড়া) জমি ও সুসংহত শ্রম বাজার। প্রচারমাধ্যমে যাই বলা হোক না কেন, শ্রম আইন সংস্কারের ক্ষেত্রে গত পাঁচ বছরে সরকার যথেষ্ট অগ্রগতি দেখিয়েছে। এ প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট সময় ভিত্তিক শ্রমিক-মালিক চুক্তির উল্লেখ করা যায়। এক্ষেত্রে চুক্তি অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর চুক্তিবদ্ধ শ্রমিককে সংস্থা ছেড়ে চলে যাওয়ার শর্ত শুরুতেই রেখে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কিন্তু আরও অনেক কিছুই করার আছে যেমন ন্যূনতম মজুরির সীমাকে খুবই উচ্চ মাত্রায় নির্ধারণ করার চাপের মোকাবিলা করা।

ন্যূনতম মজুরির সীমা খুব উঁচু ধাপে নির্ধারিত হলে (বড়ো শিল্পের ক্ষেত্রে) ছোটো উদ্যোগগুলি বেতনের উচ্চসীমা এড়াতে সদাই আরও ছোটো Micro হয়ে যেতে চাইবে যাতে ন্যূনতম মজুরি এড়ানো যায়। বড়ো হবার ইচ্ছেটাই চলে যাবে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় বিশ্বের মধ্যে ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে ন্যূনতম মজুরি বেড়েই চলেছে কিন্তু তুলনায় দক্ষতার বৃদ্ধি অতি নগণ্য। এটা বন্ধ হওয়া দরকার।

আগেই বলা হয়েছে বড়ো উদ্যোগপতির কাছে ভারতে জমি কেনা প্রায় দুঃস্বপ্নের মতো। জমির মালিকানা বহু অংশে বিভক্ত। প্রায়শই মালিকানা গোলমেলেও নানা বিবাদে যুক্ত। চলতি ভয়ংকর জমি অধিগ্রহণ আইনে আশু পরিবর্তন এনে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানো দরকার যদি এই প্রাথমিক সমস্যার সমাধান করতে হয়। আর একটা কথা, সত্যিই যদি না আমরা এই ধরনের সংস্কার করতে পারি সেক্ষেত্রে বড়োসড়ো এক একটি ৫০০ বর্গ কিলোমিটারের মতো এলাকা বা তার বেশি অঞ্চলকে Autonomous Employment Zone হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এই অঞ্চলগুলি শিল্পোন্নয়ন ও চাকরি তৈরির জন্য যোগ্য উদ্যোগপতির হাতে দিয়ে সেখানে নমনীয় জমি ও শ্রম আইন লাগু করে উৎপাদন চালু করা যেতে পারে। তাদের স্বাধীনতা দিতে হবে।

এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ চীনের shenzen শিল্পাঞ্চল। এদের মধ্যে কিছু কিছু অঞ্চল সমুদ্রতীরবর্তী হলে সেগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ রপ্তানি অঞ্চল হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। রপ্তানিই পাখির চোখ। ■

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name : **AXIS Bank Ltd.**

Branch : **Shakespeare Sarani, Kolkata**

রম্যরচনা

প্রতিশ্রুতির বন্যা

রাতে মশা তার স্ত্রীকে বলছে— কালকে তোমার জন্য বাঘ ধরে নিয়ে আসব। মনের সুখে রক্ত খাবে।

মশার স্ত্রী ঘুম জড়ানো গলায় বলল— ঠিক আছে এখন ঘুমাও।

মশা আবার বলল— কাল তোমাকে প্যারিস নিয়ে যাব। তোমাকে মার্সিডিজ গাড়ি করে ঘোরাব।

মশার স্ত্রী বলল— ঠিক আছে এখন ঘুমিয়ে পড়।

তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না, কাল তোমাকে তিন ভরি সোনার হার বানিয়ে দেব।

মশার স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বলল— বোকার মতো আজেবাজে বরবক করো না। ঘুমিয়ে পড়ো। কতবার তোমাকে বলেছি কোনো নেতা-মন্ত্রীর রক্ত খেয়ে ঘরে আসবে না। প্রতিশ্রুতির বন্যায় ঘর ভেসে যাবে। মশা লজ্জায় চুপ করে রইল।

ভালো যোগ ব্যায়াম

স্ত্রী যখনই কিছু বলবেন, আপনি ঘাড় দু'তিনবার উপর-নীচে হেলাবেন। দেখবেন এই যোগ করলে আপনার ঘরে চিরশান্তি বিরাজ করবে।

তবে মনে রাখবেন, ঘাড় ভুলেও ডানে-বাঁয়ে হেলাবেন না, বিপদ হয়ে যাবে।



উবাচ

"এই জয় আপনার প্রাপ্য ছিল। এর মাধ্যমে আপনাকে এবং আপনার ক্ষমতাকে কুর্নিশ জানানো হয়েছে। আমি জানি আপনি যখন প্রথম ক্ষমতায় আসেন তখন কত সমস্যা ছিল।"



ডোনাল্ড ট্রাম্প
আমেরিকার রাষ্ট্রপতি

জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে মোদীকে ট্রাম্পের শুভেচ্ছা

"কাশ্মীর সমস্যার মূল স্বাধীনতার পর প্রথম সরকারের নীতিতেই রয়েছে। তখন থেকেই বিচ্ছিন্নতাবাদ ও আলাদা রাজ্যের দাবির শুরু। এর দায় কংগ্রেসকে নিতে হবে। জম্মু-কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা হঠাতে হবে। আমরা এই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছি।"



রামমাধব
বিজেপি জাতীয় মহাসচিব

জম্মু-কাশ্মীরে রাষ্ট্রপতি শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে

"মানুষের আর তৃণমূলের প্রতি বিশ্বাস নেই। মানুষ তাই কাটমানির অভিযোগ নিয়ে থানায় না গিয়ে আমাদের কাছে আসছেন।"



দিলীপ ঘোষ
রাজ্য বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ

দিল্লিতে সংসদের বাইরে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি প্রসঙ্গে

"মুখ্যমন্ত্রীর আঁকা ছবি নাকি ২ কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছিল। এখন আবার তিনিই কাটমানি ফেরত দেবার কথা বলছেন। আমরা কাটমানি ফেরতের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে ধরনা দেব।"



অর্জুন সিংহ
বিজেপি সাংসদ

মমতার কাটমানি ফেরত দেবার নির্দেশ প্রসঙ্গে

আমাদের নির্বাচনী গণতন্ত্রের সংকট এখনো কাটেনি

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

এই কথা আর অস্বীকার করা চলে না যে, আমাদের দেশ এখন এক গভীর সঙ্কটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সংবিধান তার প্রস্তাবনায় (Preamble) গণতন্ত্রকে (democracy) অন্যতম রাজনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করলেও সেটা এখানে জনতন্ত্র, মুখ্যতন্ত্র ও মূর্খতন্ত্রের এক বিচিত্র আকার ধারণ করেছে। নেতাদের অনেকে সৎ, নিষ্ঠাবান ও কর্তব্যপরায়ণ হলেও বর্তমানে অর্থ-প্রাচুর্য, অশিক্ষা ও অপরাধের মিশ্রণে তাঁদের একটা বড়ো অংশে দেখা দিয়েছে সর্বনাশের নেশা।

গণতান্ত্রিক শাসন প্রসঙ্গে আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছেন, এটা 'of the people, for the people and by the people।' অর্থাৎ এটা জনগণের, জনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা শাসিত ব্যবস্থা।

কিন্তু লর্ড ব্রাইস যথার্থই মন্তব্য করেছেন, জনসাধারণ একত্রিত হয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে দেশের শাসন চালাতে পারেন না জন-বাহুল্য ও মতভেদের কারণে। তার ফলে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিদের ক্ষমতায় বসানো হয়। এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে পরোক্ষ গণতন্ত্র এবং গুরুত্ব লাভ করেছে নির্বাচন ব্যবস্থা।

এই কারণেই এখনকার গণতন্ত্রে নির্বাচন একটা জরুরি বিষয়, আর সেটাকে হতে হয় অবাধ ও মুক্ত। এই প্রসঙ্গে ড. হরিহর দাস মন্তব্য করেছেন, 'The success of democracy depends upon free and fair election'— (ইন্ডিয়া : ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ৯০২)।

আমাদের সংবিধান রচয়িতারা জানতেন যে, নির্বাচনী ব্যবস্থা সরকারের হাতে থাকলে গণতন্ত্র প্রহসনে পরিণত হবে— শাসকরা ধ্বংস করবেন গণতন্ত্রের শিকড়কেই। গণপরিষদে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু বলেছিলেন, এর ফলে 'democracy will be poisonal at the root।' এই কারণেই আমাদের সংবিধান নির্বাচনকে একটা পৃথক পরিচ্ছেদে রেখেছেন এবং ৩২নং অনুচ্ছেদে ভোটার তালিকা তৈরি, নির্বাচন পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ, ফল প্রকাশ ইত্যাদির জন্য একটা নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থা রেখেছেন। এই সংস্থা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। তার কাজই হলো নির্বাচন ব্যবস্থাকে একটা সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক রূপ দেওয়া— (ড. এস. সি. পাইলি— অ্যান্ ইন্ট্রোডাকশান টু দ্য কন্স্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২৭২)।

সেই সঙ্গে সংবিধান ৩২৬ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীকে ভোটাধিকার দিয়েছে। আর বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করে এই কমিশন চেয়েছে যাতে নির্বাচন ব্যবস্থা প্রকৃত গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করে— (ড. এস. সি. কাশ্যপ আওয়ার কনস্টিটিউশান, পৃ. ২৫৬)।

আমাদের সংবিধান প্রার্থীদের ন্যূনতম শিক্ষার মান নির্দিষ্ট করে দেয়নি। কিন্তু অ্যারিস্টট্ল্ লিখেছেন— রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, ধর্ম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নিরন্তর চর্চার মাধ্যমেই প্রতিনিধিরা মানুষকে চালিত করবেন— এটাই কাম্য। কিন্তু তাঁরা অর্ধশিক্ষিত হলে দেশকে চালিত করবেন কোন্ দিকে?

কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও আমাদের নির্বাচন-ব্যবস্থা আদৌ সুষ্ঠু, স্বাভাবিক ও স্বচ্ছ হয়নি— ক্রমে তাতে এসেছে অর্থ, অস্ত্র, অশিক্ষা ও অন্যায়ের দৌরাত্ম্য। অনেক ক্ষেত্রেই নেতা, পুলিশ ও দুষ্কৃতীদের মহা মিলনের ফলে নির্বাচন একটা ব্যয়বহুল প্রহসনে পরিণত হয়। আর তাতে অনেকেই এই ব্যাপারে আগ্রহহীন হয়ে পড়েছেন। যেখানে পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোতে ৮০---৯০ শতাংশ মানুষ ভোট দেন, আমাদের দেশে সেটা ৬০ শতাংশের নীচেও নামে তাতে থাকে ছাপ্পা ভোটও। ১৯৬৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে সেটা ছিল মাত্র ৫৫ শতাংশ। আর কোটি কোটি ভোটার 'নোটা'র মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে, সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের কোনও প্রার্থীকেই তাঁদের পছন্দ নয়।

সবচেয়ে বড়ো কথা--- ব্যালটের আবির্ভাব ঘটেছিল বুলেটকে বিদায় দেওয়ার জন্য। অথচ এখন বুলেটই ব্যালটকে নিয়ন্ত্রিত করে। অনেক ক্ষেত্রে শাসক দলের বিরুদ্ধে প্রার্থী পাওয়া যায় না।

প্রথমত, রাজনীতিকে এখন গ্রাস করেছে দুর্বৃত্তায়ন। অনেক নেতার পেছনের থাকে দুষ্কৃতীরা— তারাই ভোটকে নিজেদের কাজে লাগায়, পেছনে থাকে নেতা-মন্ত্রীর উৎসাহ। প্রত্যেক নির্বাচনে কিছু ভোটার ও ভোট-কর্মী হতাহত হন। বুথ-জাম্, বুথ-দখল, ভীতি প্রদর্শন, রক্তক্ষরণ ইত্যাদি এখন আমাদের নির্বাচনের অপরিহার্য্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ড. এ. সি. কাপুর লিখেছেন, এটা বেশি দেখা যায় বিহার, উত্তরপ্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে। তাঁর ভাষায়— 'Capturing of polling booths has become a routine–proceess by organised and armed gangs of hoodlums'— (দ্য

ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম, পৃ. ৪২৫)। আগে অনেক নেতার পেছনে থাকত সশস্ত্র অপরাধীরা, তখন তাদের কেউ কেউ প্রার্থীও হতো। ডাকাতও প্রার্থী হয়েছে কোথাও কোথাও।

একবার উত্তরপ্রদেশের এক বিজয়ী প্রার্থী একজন ডাকাতকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন তাঁকে সাহায্য করার কারণে।

গত লোকসভার ২৭৯ জন প্রার্থীর বিরুদ্ধেই মামলা ছিল— তার মধ্যে লুঠ, চুরি, ভীতি-প্রদর্শন, নির্যাতন ইত্যাদি মারাত্মক অভিযোগ ছিল। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার ২য়, ৫ম, ও ৬ষ্ঠ দফা নির্বাচনে যথাক্রমে ১০৭, ৯৬ ও ১৩৯ জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে এই ধরনের মামলা ছিল। সুতরাং বলা চলে— এখন রাজনীতি ও অপরাধ জগৎ পাশাপাশি চলছে।

দ্বিতীয় সমস্যাটা প্রাচুর্যের। দেখা যাচ্ছে--- ভোটের লড়াইতে এখন কোটিপতিদের ভিড়। দেশে এখন দরিদ্রের সংখ্যা অন্তত ৩০ শতাংশ। হিসেবে দেখা যাচ্ছে— দারিদ্র্যসীমার নীচে এখনও আছেন প্রায় ৪০ কোটি মানুষ। অপুষ্টির শিকারও অন্তত ২০ কোটি নর-নারী। 'গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্স'-এ আছে বিশ্বের ১১৯টা দেশের মধ্যে দারিদ্র্যের দিক থেকে ভারতের একটা বড়ো স্থান আছে।

অথচ কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা ক্রমে বেড়ে চলেছে। 'অ্যাসোসিয়েশান ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস্' ও 'ন্যাশনাল ইলেকশান ওয়াচ্' জানিয়েছে যে, দেশের ৮৩ শতাংশ সাংসদই কোটিপতি। আর তাঁরা বিভিন্ন দলের সদস্য। আরও জানা গেছে— তাঁদের ৫২১ জনের সাম্প্রতিক গড়-পরিমাণ ১৪.৭২ কোটি টাকা। তাছাড়া ১৭৪ জনের বিরুদ্ধে খুন, নারীহরণ ইত্যাদির অভিযোগও ছিল।

অবশ্যই ধনী হওয়াটা অপরাধ নয়। কিন্তু তাঁদের এই বিপুল সম্পদের উৎস আমরা জানি না। তাছাড়া অর্ধভুক্ত, ছিন্নবস্ত্রপরিহিত মানুষদের দুঃখ-কষ্ট কি তাঁরা বুঝবেন?

প্রাচীন গ্রিক্ দার্শনিক প্লেটো চেয়েছিলেন 'ফিলসফার-কিং'-কে। আর তাঁর প্রিয় শিষ্য অ্যারিস্টটল্ বলেছিলেন আদর্শবাদী ও উচ্চ-শিক্ষিত জননেতারাই আদর্শ রাষ্ট্র গড়তে পারবেন।

কিন্তু তৃতীয় সমস্যাটা এসেছে এই সূত্রেই। আমাদের দেশের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বিচিত্র চিত্র— উচ্চ শিক্ষিত প্রার্থীর সংখ্যাটা কমে আসছে। মনোনয়ন পত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার উল্লেখ করতে হয়। সেখানে কেউ কেউ জানিয়েছেন, তাঁরা 'নন্-ম্যাট্রিক'। কিন্তু শব্দটার অর্থ স্পষ্টই নয়। কেউ কেউ আবার নিরক্ষরও।

অবশ্যই আমাদের সংবিধান প্রার্থীদের ন্যূনতম শিক্ষার মান নির্দিষ্ট করে দেয়নি। কিন্তু অ্যারিস্টট্ল্ লিখেছেন— রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, ধর্ম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নিরন্তর চর্চার মাধ্যমেই প্রতিনিধিরা মানুষকে চালিত করবেন— এটাই কাম্য। কিন্তু তাঁরা অর্ধশিক্ষিত হলে দেশকে চালিত করবেন কোন্ দিকে?

প্রাক্তন সাংসদ রেণুকা রায় তাঁর 'মাই রেমিনিসেন্সেস' গ্রন্থে লিখেছেন— হীরেন মুখার্জী, ড. লোহিয়া, হরিবিষ্ণু কামাক, আচার্য কৃপালনী প্রমুখ সদস্যরা উঠেই কংগ্রেসের নিন্দা করতেন, অথচ কংগ্রেসি হয়েও তিনি মুগ্ধ হয়ে শুনতেন সেই উচ্চাঙ্গের ভাষণ।

অথচ এখন সেই রকমটা হয় না। অনেকেই আসেন না— একটা অধিবেশনে ছিলেন মাত্র ৫৬ শতাংশ সদস্য। ৪৮ শতাংশ সদস্য মুখই খোলেননি, ৫২ শতাংশ দু-একটা বিষয়ে কথা বলেছেন। তাঁর কারণ হলো, তাঁরা বিতর্কের বিষয়বস্তুই বোঝেননি। একজন সদস্যা একবারই একটা প্রশ্ন করেছেন পাঁচ বছরে, অন্য একজন চারটে বিষয় তুলেছেন কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকে নিয়ে গেছেন ১৮ লক্ষ টাকা।

উচ্চাঙ্গের বিতর্কের বদলে এখন হইচই, গণ্ডগোল বেশি হয় বলে অনেকে মনে করেন। ড. বি.সি. রাউত মন্তব্য করেছেন, অনেকের আচরণ 'deplerable'— 'They donot maentain dignity and decorum'--- (ডেমোক্র্যাটিক কন্স্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ১৫৯)। অনুরূপভাবে এস. এল. সিক্রি লিখেছেন, 'Most of the debates are ill-attended and ineffective. They are worse than a primary-School dabates'— (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স পৃ. ১৮৪)।

তাহলে আমরা চলেছি কোথায়? এই গণতন্ত্রই আমাদের কাম্য ছিল?

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলেন, গণতন্ত্রের সাফল্য কতকগুলো শর্তের ওপর নির্ভর করে—

১. জনসাধারণকে রাজনীতি-অর্থনীতি বিষয়ে সচেতন ও শিক্ষিত হতে হবে। কিন্তু তা না হলে সুবিধাবাদী নেতারা সহজেই সব কিছুকে গ্রাস করবেন।

২. জনসাধারণ ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ দেখবেন না— তাঁদের কাছে প্রাধান্য পাবে জাতীয় স্বার্থ।

৩. জনমত হবে সদা জাগ্রত ও বুদ্ধি নির্ভর।

৪. জনসাধারণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন বুদ্ধি, বিবেচনা ও বিজ্ঞতার সঙ্গে। লর্ড ব্রাইস মন্তব্য করেছেন, 'the gift of suffrage creates the will to use it and the gift of knowledge creates the capacity to use the suffrage'— মডার্ন ডেমোক্র্যাসিস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭১)।

৫. আর চাই সহনশীলতা, যুক্তিপূর্ণ পরমত গ্রহণের উদারতা গণতন্ত্রকে সার্থক করে তোলে—(রিফ্লেক্সান্স্ অব্ গভর্নমেন্ট, পৃ. ৬৩)।

কিন্তু এই দেশে প্রাথমিক কাজটাই হয়নি। এখানে কোটি কোটি মানুষ অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে আছেন। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দারিদ্র্য। তাই সহজেই তাঁরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও অসাধু নেতাদের কথা ও লোভের ফাঁদে পা দেন।

অ্যারিস্টটল মনে করতেন— বহুর শাসন কল্যাণমুখী হলে সেটা হয় polity— তাতে বিকৃতি এলে দেখা দেয় ডেমোক্র্যাসি। আমাদেরটা কি সেই অর্থেই গণতন্ত্র? ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

এক দেশ এক নির্বাচন ব্যবস্থায় সমৃদ্ধ হবে দেশ

আর. কে. দে

প্রতিটি নব নির্বাচিত সরকারের কিছু নির্দিষ্ট অঙ্গীকার, পরিকল্পনা এবং অ্যাজেন্ডা থাকে। ২০১৪-এর পর মোদী সরকার প্ল্যানিং কমিশনের নাম পরিবর্তনে করেছিল। নতুন নাম হয়েছে নীতি আয়োগ। ধীরে ধীরে আমরা দেখেছি জিএসটি, বিমুদ্রীকরণ অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়াদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ প্রভৃতি গত সরকারের সাহসী পদক্ষেপ। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের অভূতপূর্ব জনাশীর্বাদ নিশ্চয় গত ৫ বছরের সন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়েছে। তবে মোদী সরকারের সম্মুখে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম সংবিধানের ধারা ৩৭০ এবং ৩৫ (এ)-র উচ্ছেদ, জন্মনিয়ন্ত্রণ আইন লঘুকরণ, তিন তালাক নিষিদ্ধকরণ, এক দেশ এক আইন এবং অবশ্যই এক দেশ এক নির্বাচন প্রভৃতি ইস্যুর বাস্তবায়ন করা। স্বাভাবিকভাবে খোদ শরিক দলের সঙ্গে মতবিরোধ সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলের চরম প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে সংবিধান সংশোধন মোটেই সহজতর নয়। তবে সরকারের দৃঢ় মানসিকতা এবং রাজনৈতিক পারদর্শিতায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকেও বাগে আনা সম্ভব যেটা আমরা বিগত সরকারের অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়াদের সংরক্ষণে দেখেছি। বৃহত্তর জনস্বার্থকে মাথায় রেখে দেশের সকল রাজনৈতিক শক্তির সরকারের পাশে দাঁড়ানো একান্ত কাম্য, অন্যথায় বিরোধীদের ভোট পুঁজি জনসমর্থন খুইয়ে ক্রমান্বয়ে তলানিতে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। সরকারের বিহরোধিতা করা মানে এই নয় যে তার জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বা যোজনায় বাধা সৃষ্টি করা।

‘এক দেশ এক নির্বাচন’ কোনো ভাবেই আঞ্চলিক রাজনৈতিক পার্টির জন্য বিপদসংকেত নয়। এটা ঠিক জিএসটি, বিমুদ্রীকরণের মতো ‘এক দেশ এক নির্বাচন’ ব্যবস্থায়ও সাময়িক কিছু অসুবিধা আসবেই, তবে কেন্দ্রে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারের সুফল তো দেশবাসী পাবেই।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী ‘এক দেশ এক নির্বাচন’ ইস্যু নিয়ে দিল্লিতে সর্বদলীয় এক বৈঠকের আহ্বান করেন। প্রত্যাশিতভাবে বৈঠকটি কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজবাদী পার্টি, ডিএমকে বৈঠকে অংশগ্রহণ করেনি। বিরোধীরা ইস্যুটিকে পাশ কাটিয়ে ইভিএমের পরিবর্তে ব্যালট ভোট ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের কাছে আর্জি জানান। বর্তমানে ‘এক দেশ এক নির্বাচন’ একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় থাকলেও এর সূচনা হয়েছিল ১৯৫২ সালে। সেবার ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন এবং প্রতিটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে হয়। খরচ হয়েছিল ১০



নীতি আয়োগ আয়োজিত বৈঠকে নরেন্দ্র মোদী।

কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত 'এক দেশ এক নির্বাচন' ধাঁচে পুরো দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৫২ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত 'এক দেশ এক নির্বাচন' ধাঁচে পুরো দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল কিন্তু মাঝপথে অনেক রাজ্য সরকার ভেঙে যাওয়ায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এককালীন এই নির্বাচন ব্যবস্থা প্রথম ভেস্তে যায়। ১৯৭৭ সালে প্রথম যে অকংগ্রেসি সরকার এসেছিল সেটিও পুরো মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেনি। বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন ছাড়াও পৌর ও পঞ্চায়েত নির্বাচন লেগেই থাকে। ২০১৪ সালের ষোড়শ সাধারণ নির্বাচনে ওড়িশা ও তেলেঙ্গানা ছাড়াও দুটো কেন্দ্র শাসিত রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে খরচ হয়েছিল প্রায় ৩ হাজার ৮৭০ কোটি টাকা। বর্তমান সরকার রাজকোষের এই অর্থ অপচয় রোধে সময় ও প্রশাসনিক ক্ষমতা সাবলীল রেখে দেশের সাধারণ নির্বাচনকে সরল রাখতেই এই 'এক দেশ এক নির্বাচন'-এর প্রস্তাব এনেছে। প্রস্তাবটিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০১৬ সাল থেকে সক্রিয় ছিলেন, সেই সুবাদে দেশের আইন কমিশন সংবিধানের কিছু নীতি পরিবর্তন ও সংশোধনের সুপারিশ করেছে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম ধারা ৮৩-তে সংসদের দুই কক্ষের মেয়াদের কথা বলা হয়েছে, ধারা ৮৫-তে লোকসভা ভেঙে দেওয়ার নথিবদ্ধ রয়েছে এই ধারায়, ধারা ১৭২-তে রাজ্যে বিধানসভাগুলির মেয়াদের কথা বলা হয়েছে, ধারা ১৭৪-তে বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার নিয়ম নথিভুক্ত রয়েছে, ধারা ৩৫৬-তে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির বিধি নথিভুক্ত। ১৯৫১ সালের তৈরি জনপ্রতিনিধিত্ব আইনেও সংশোধনী প্রক্রিয়া করতে হবে। উল্লেখিত এই ধারাগুলি সংশোধন না করলে 'এক দেশ এক নির্বাচন' কোনো ভাবেই সম্ভবপর নয়। ২০২৪ সালে দেশের পরবর্তী অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন অর্থাৎ সেই বছরে লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে ২৯টি রাজ্যে ও দুটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে। কিন্তু ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে বিধানসভা নির্বাচন, গুজরাট ও উত্তরপ্রদেশে ২০২২ সালে অর্থাৎ এই সমস্ত রাজ্যের বিধানসভার মেয়াদ শেষ হবে যথাক্রমে ২০২৬ এবং ২০২৭ সালে। ২০২৪ সালে 'এক দেশ এক নির্বাচন' ধাঁচে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে এই সমস্ত অনেক রাজ্যের বিধানসভার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার অনেক আগেই ভেঙে ফেলতে হবে। কিন্তু 'এক দেশ এক নির্বাচন' হলেই যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার তাদের ৫ বছরের নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করতে পারবে বা কোথাও ৩৫৬ ধারা জারি হবে না এর নিশ্চয়তা তো নেই! তাই নির্বাচন সম্পর্কিত সব ধারা সংশোধন করে সরকারকে সুনিশ্চিত করতে হবে যে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের কোনো কারণে ভেঙে গেলেও অকাল নির্বাচনের কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতে অকাল নির্বাচন বন্ধ করা তখনই সম্ভব যদি ভারতও আমেরিকা ধাঁচে রাষ্ট্রপতিকেন্দ্রিক সরকার গঠনের পথ বেছে নেয়। অর্থাৎ কেন্দ্রে বা রাজ্যে যদি কোনো সরকার মাঝপথে ভেঙে যায় তবু আইনসভা নির্দিষ্ট ৫ বছর যাবৎ বৈধ থাকবে, চেষ্টা করা হবে নতুন কোনো মন্ত্রীসভা গঠন করার। তাও যদি সম্ভবপর না হয় তাহলে জারি হবে রাষ্ট্রপতি শাসন। অর্থাৎ 'এক দেশ এক নির্বাচন' সংজ্ঞায় দেশের কোনো প্রান্তে অকাল নির্বাচনের আর কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। তবে প্রয়োজনানুসারে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে এই নির্বাচন নীতি কোনো বাধানিষেধ আরোপ করবে না।

একটি বেসরকারি সংস্থা মিডিয়া স্টাডিজ-এর এক রিপোর্ট অনুসারে ২০১৯-এর সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে খরচ হয়েছে পায় ৬০ হাজার কোটি টাকা। মূলত রাজকোষের এই অপচয় রোধ করতেই 'এক দেশ এক নির্বাচন-এর কৌশল। ১৯৫২, ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৭-তে দেশের সকল রাজ্যে এবং কেন্দ্রে এক সঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর ১৯৬৭-এর পরে দেশে বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলির শক্তি বৃদ্ধি হওয়াতে অনেক রাজ্যে অকাল ভোটের প্রকট ঘটে। ১৯৭১, ১৯৮০, ১৯৮৪, ১৯৯১, ১৯৯৮, ১৯৯৯ সালে কেন্দ্রে সরকার নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ না করে ভেঙে যায়। প্রধানমন্ত্রীর ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে ৪০টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ২১টি অংশগ্রহণ করে তাঁরা সমর্থন জানায়, তবে কয়েকটি যুক্তি ও শর্তের সঙ্গে। বৈঠক বয়কটকারী তৃণমূল কংগ্রেসের মতো আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল মনে করে এইরকম নির্বাচনে তারা অস্তিত্ব সংকটে পড়ে যাবে। কংগ্রেসিরা মনে করছে এটা নরেন্দ্র মোদীর কেন্দ্রে দীর্ঘ শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার একটি চাল। সপা-বসপা বলছে ইভিএম থেকে জনসাধারণকে নজর ঘোরানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর একটা নতুন পরিকল্পনা।

ভারতের পূর্ব নির্বাচন কমিশনার এস ওয়াই কুরেশি 'এক দেশ এক নির্বাচন' ব্যবস্থাকে সমর্থন করে জানান এই নির্বাচন ব্যবস্থাটি দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করবে। তবে নির্বাচন কমিশনের ভাষ্য অনুযায়ী নতুন করে নির্বাচন ব্যবস্থাটি চালু করতে এককালীন ইভিএম এবং ভিভিপিএটি ক্রয় করতে অতিরিক্ত খরচ লাগবে প্রায় ৯ হাজার ২৮৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। একটি বেসরকারি সমীক্ষায় দেখা গেছে কোনো রাজ্যে লোকসভা ও বিধানসভা ভোট এক সঙ্গে হলে ৭৭ শতাংশ ভোটার একই দলকে ভোট দেন। কিন্তু রাজ্য ও কেন্দ্র স্তরের রাজনৈতিক ইস্যু সম্পূর্ণ আলাদা থাকে, তাই এই সমীক্ষা যথেষ্ট গুরুত্ব পাবে বলে মনে হয় না। উদাহরণ স্বরূপ, এবার ২০১৯ এর সপ্তদশ নির্বাচনে ওড়িশায় রাজ্য ও কেন্দ্র স্তরের নির্বাচনে লোকসভায় বিজেপি বেশি ভোট পেলেও বিধানসভায় বিজেডি জয়ী হয়েছে। ১৪৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে বিজু জনতা দল (বিজেডি) পেয়েছে ১১২টি এবং বিজেপি পেয়েছে মাত্র ২৩টি আসন। পক্ষান্তরে সেখানে ২১টি লোকসভা কেন্দ্রে বিজেডি পেয়েছে ১২টি এবং বিজেপি ৮টি। অনুরূপভাবে এই নির্বাচনে বিজেপির পদ্ম পুরো দেশে ফুটলেও অন্ধ্রপ্রদেশে জগমোহন রেড্ডি বিধানসভা ও লোকসভায় ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সুতরাং 'এক দেশ এক নির্বাচন' কোনো ভাবেই আঞ্চলিক রাজনৈতিক পার্টির জন্য বিপদসংকেত নয়। এটা ঠিক জিএসটি, বিমুদ্রীকরণের মতো 'এক দেশ এক নির্বাচন' ব্যবস্থায়ও সাময়িক কিছু অসুবিধা আসবেই, তবে কেন্দ্রে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারের সুফল তো দেশবাসী পাবেই। ■

ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতই নেতৃত্ব দিতে পারে

ডাঃ আর দাস

সারা পৃথিবীতে এখন তিনটি ধারার লড়াই চলছে। আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন গ্রিকদের থেকে পাওয়া ইউরোপীয় সভ্যতা, চীনের মাটিতে উৎপন্ন কনফুসিয়ান দর্শনে মোড়া মার্কস ও মাওবাদ। আর সবচেয়ে নবীন যা আরব থেকে উৎপন্ন হয়ে বিশ্বত্রাস হিসেবে অখ্যাতি অর্জন করেছে তা হচ্ছে ইসলাম। প্রোফেসর সাম্যুয়েল হান্টিংনের সঙ্গে লেখক এক মত হতে পারেননি। তাঁর লেখা বিখ্যাত বই, 'দ্য ফাইনাল ক্ল্যাস অব সিভিলাইজেসন্স'-এ শুধু পাশ্চাত্য মানে খ্রিস্টীয় সভ্যতার সঙ্গে শুধু ইসলামের সংঘর্ষের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু হিন্দু বাঙ্গালি হিসাবে লেখকের মতে গত ১০০ বছরে ভারতের উপর চীনের প্রভাব, ভারত বিভাজন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সৃষ্টির কথা। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির জন্মের সঙ্গেই সনাতন ধর্মের অবমাননা ও বিপদ-সংকেতের শুরু হয়। প্রো. হান্টিংটন আগ্রাসী কমিউনিজমের সঙ্গে সংঘর্ষের গুরুত্বটি কেন দিলেন না, জানি না!

ইউরোপ এখন সভ্যতার সংকটে দিন কাটাচ্ছে। ইদানীং সেখানে নানা ধরনের প্রবণতার সংক্রমণ দেখা দিয়েছে। পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের অবসান হয়েছে। শুধু ফুটবল, সংগীত-সম্মেলন আর সমুদ্রসৈকতে রৌদ্রস্নান। আর হয়েছে স্রোতের মতো অবাধ ইসলামিক অনুপ্রবেশ। সরকার বিয়ে করার জন্য, সন্তান উৎপাদন করার জন্য নানা ভাবে প্রোৎসাহনের ব্যবস্থা করছে কিন্তু তবুও জন্মহার একের বেশি হচ্ছে না। পরিসংখ্যানবিদরা বলেন, যে দেশে জন্মহার ১.৮ এর নীচে সে দেশে সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। প্রতিটি মুসলমান পরিবারে ৮-১০টা সন্তান। যাদের চারটা বিবি তাদের চল্লিশটা সন্তান। ইতিহাস প্রসিদ্ধ মুমতাজ ছিলেন শাজাহানের ৪নং বিবি। ১৪তম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়েই বেচারা মারা যান!

ইউরোপে সঞ্চয় বা মিতব্যয়িতা বলে কিছু নেই। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে না। শুধু বর্তমানের কথা চিন্তা করে। ভোগবাদ অবলম্বন করে জীবনযাত্রা নির্বাহ। লোকবল নেই বললেই চলে! সারা ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, প্রতিটি দেশেই প্রতিরক্ষা ও



সৈন্যসামর্থ্য একেবারে তলানিতে। ইউরোপ নির্ভর করে আছে আমেরিকা আর সম্মিলিত ন্যাটোর শক্তির উপর। এখন শুনলে মোটেই অবাক হবেন না, পশ্চিমের সব দেশই চায় ট্যাটোর অন্তর্ভুক্ত হোক ভারত। জাতিসঙ্ঘের শান্তিবাহিনীতে ভারতের সৈন্যশক্তিই সব থেকে বেশি। ভারতকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সুরক্ষাপরিষদে এখনও কিন্তু স্থায়ীপদ দেওয়া হয়নি। মোদীর প্রচেষ্টায় হয়তো এবার বহু কাম্য সুরক্ষা পরিষদের স্থায়ীপদটি পেয়ে যাবে ভারত। পশ্চিমের সাদাচামড়ার প্রভুরা চাইবে আমেরিকার স্বার্থ ও ইউরোপের সীমান্তরক্ষার দায়িত্বটি ভারতের শান্তিবাহিনী নিক! ইসলামিক আগ্রাসনের হাত থেকে ইউরোপকে রক্ষা করতে হবে যে!

সম্ভবত আফগানিস্তান থেকে আমেরিকা পাততাড়ি গোটাবে শীগগিরই। আর ভারতকে তালিবানের ধাক্কা সামলাতে হবে একাকী! চীন ও পাকিস্তানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তালিবান মধ্যএশিয়ায় সন্ত্রাসবাদকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। কন্সট্যান্টিনোপল বিজয় হয়ে গেছে, এখন বাকি আছে পোপের ভ্যাটিকান, ইজরায়েলের জেরুজালেম, আমেরিকার নিউইয়র্ক ও ভারতে গাজওয়া-ই-হিন্দ। তাহলেই সারাবিশ্বে ইসলামের শরিয়া আইন ও খলিফার শাসন চালু হয়ে যাবে। কোটি কোটি হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈনের সঙ্গে ইহুদি-খ্রিস্টানদের পাইকারি হারে গণহত্যা করা হবে। মনে রাখবেন, ইরানের শিয়া বা আহমদিয়ারাও বাদ যাবেন না সুন্নি নামক 'ওয়াহাবি, তৌহিদি ও সালফি' মুসলমানদের শুদ্ধ জেহাদের কোপ থেকে। আজকের লোভী সুবিধাবাদী বামবুদ্ধিজীবীরাও রেহাই পাবেন না। মধ্যযুগীয় ইসলামের কাছে বামপন্থা, সেকুলারিজম ও ডেমোক্রেসির কোনো মূল্যই নেই। ইসলামের শরিয়া আইনে সর্বপ্রথমে এই বুদ্ধিজীবীদের শেষ করা হবে। সমগ্র বিশ্ব তখন 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনিতে ধরিত্রী কম্পিত হতে থাকবে!

একটা কথা স্মরণযোগ্য। ২০০০ সালে জার্মানির চান্সেলর সক্রোয়েডর ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি বিজ্ঞানে শিক্ষিত যুবকদের গ্রিনকার্ড দেওয়া শুরু করেন, কিন্তু কট্টরপন্থী পাদরি জোসেফ স্ট্রস হিন্দুধর্মের দ্বারা তাদের দেশের প্রভাবিত হওয়ার অশনি সংকেত দেখতে পান। যথারীতি তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলনও সফল হয় এবং ভারতীয় প্রযুক্তিবিদদের তৎক্ষণাৎ বিতাড়িত করা হয়। কিন্তু বিড়ম্বনা দেখুন, ২০১০ সালে চ্যান্সেলর এঞ্জেলা মার্কেল সিরিয়া, ইয়েমেন ও ইরাক থেকে অশিক্ষিত, কর্মহীন মুসলমানদের অবলীলায় গ্রিনকার্ড দিচ্ছেন। বছরে এক লক্ষ সিরিয়া ফেরত জেহাদির জার্মানিতে পুনর্বাসন। সরকারি পয়সায় থাকা খাওয়াদাওয়া মায় বাচ্চা উৎপাদন করার জন্য প্রোৎসাহন। এখন রিফিউজি মুসলমানরা জার্মান মেয়েদের বলাৎকার করছে দিনেদুপুরে! তারা হচ্ছে অনথিভুক্ত নাগরিক! সেখানে দাড়িগোঁফ কামানো অনাথ কিশোরদের বয়স হচ্ছে মাত্র ২৫-৩০, ঠিক যেমনটি আমরা দেখি কাশ্মীরের

পাথর নিক্ষেপকারী অবোধ বালকদেরকে! কী আশ্চর্য, দিল্লিতে মোহম্মদ আফরোজ নির্ভয়া কাণ্ডে নাবালকের প্রমাণপত্র জোগাড় করে ছাড়া পেয়ে যায়, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সহায়তায়!

আরও আশ্চর্যের কথা, ৪০-৫০ বছর বয়সেও মুসলমানরা নাকি যুবকই থাকে। শতকরা ৫০ জনই হচ্ছেন কর্মহীন। আর এই সময়ে ইউরোপে বেকারত্ব চরমসীমায় পৌঁছেছে। সরকার তাদের বিশেষ আর্থিক সুবিধা আর মহার্ঘভাতা দিয়ে পুষছেন। সেই জন্যই কংগ্রেসের ইতালীয়ান সোনিয়া মাইনোর ছেলে রাহুল ৪৮ বছরে কিংবা করুণানিধির ছেলে এম. কে. স্ট্যালিন ৬৩ বছরেও যুবনেতা হয়ে দল চালাচ্ছেন। কেননা এঁরা সবাই ইউরোপীয় কিনা!

শিল্পবিপ্লবের দিন থেকেই ইউরোপে গত ৩০০ বছর ধরে খ্রিস্টধর্মের অবনতি ঘটে চলেছে। দিনদিন চার্চের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। পোপ নিজে বলেছেন, ইউরোপে আবার খ্রিস্টধর্মের প্রসার করতে হবে। এর কারণ হলো খ্রিস্টধর্মের প্রতি আস্থাহীনতা, পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের অধঃপতন, শিল্পবিপ্লবোত্তর সময়ে সামাজিক অবক্ষয়, সাম্য ও ভোগবাদ নামক বিষ, গর্ভনিরোধক প্রণালীর বিপ্লব ও ভ্রূণহত্যার সরকারি অনুমোদন। তাই ধর্মহীন মানুষ স্বেচ্ছায় গির্জাগুলি বিক্রি করে দিচ্ছে। গুজরাটের স্বামীনারায়ণ মন্দির কর্তৃপক্ষ সে সব কিনে মন্দির করছেন। প্রতি রবিবার গির্জায় লোক পাওয়া যায় না। বিশাল ফাঁকা হলঘরে সামনের সারিতে গুটিকয় অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধার আকুতি শোনা যায় আর আফ্রিকার কালোচামড়ার বিশপের ধর্মোপদেশ। সেই জন্য বোধহয় ভারতে সাদাচামড়ার শিষ্য-শিষ্যাদের ইসকন মন্দিরগুলিতে ভিড় দেখা যায়! আর নেপালের মতো হিন্দুরাষ্ট্রে বা পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশার প্রত্যন্ত গ্রামে বা দক্ষিণ ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে সাদাচামড়ার পাদরিদের অসহনীয় উৎপাতের কথা প্রায়ই খবরের কাগজে উঠে আসে!

আজকের ইউরোপে আধুনিকতার নামে সনাতন সমাজের নৈতিকতাকে কুসংস্কার ও গোঁড়ামির ব্যাখ্যা দিয়ে বিবাহবিহীন সন্তান, সমলৈঙ্গিক বিবাহ, পাব-কালচার ও তথাকথিত সংস্কারমুক্ত উদারবাদী এবং বামপন্থীরা একে শুধু অনুমোদনই নয়, বরং পুরানো ঐতিহ্যবাদকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন এক যুগের সূচনা করতে চাইছেন। বিশ্বের সবচেয়ে সম্পদশালী জর্জ সোরসের মতো বহুলোকই এর সহায়ক ও সমর্থক। বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়, যখন দেখি এই বুদ্ধিজীবীর দল ইসলামের অন্ধ কুসংস্কার ও মধ্যযুগীয় গোঁড়ামিকে নির্দ্বিধায় মেনে নিচ্ছেন।

পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান বা ইন্দোনেশিয়ায় এইসব বামপন্থীদের ইসলামিক জিহাদিরা প্রথমেই শেষ করে দিয়েছে। এই বামপন্থীদের কাজ হচ্ছে হিন্দুদের মধ্যে ইসলামের প্রসার প্রচারে সাহায্য করা। দুর্গাপূজার মণ্ডপে বা কালীপূজার প্যান্ডেলে সবাই দেখেছি বামপন্থী বঙ্গীয় বিজ্ঞানমঞ্চের লালশালুতে মোড়া মার্কসীয় সাহিত্যের স্টল। ইদ বা মহরমের সময় বা মসজিদের সামনে এরকম স্টল খোলার সাহস দেখাতে পারেন না এই মাকুরা।

ইসলামের মুলমন্ত্রই হচ্ছে সারা বিশ্বকে তাদের শাসনের আওতায় আনা। আসমানি কিতাবে নাকি লেখা আছে ভারতকে গাজওয়া-ই- হিন্দ করা! ইসলামিক ইতিহাসের অসমাপ্ত অধ্যায়ের সমাপ্তি আর কী! আজ লন্ডনের মেয়র সাদিক খান ও স্বরাষ্ট্র সচিব জাভেদ সাজিদ কুখ্যাত মৌলভি আঞ্জেম চৌধুরীর সাহায্যে লন্ডনিস্তানকে করতে চায় ইউরোবিয়ার রাজধানী! মনে রাখবেন, স্পেন মধ্যযুগে ৬০০ বছর আফ্রিকার মুসলমান মুরেদের অধীনে ছিল। বাকিংহ্যাম প্যালেসকে তারা মসজিদ করতে চাইছে। রানিকে ইসলাম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছে। আর কম খরচের জিহাদ সংগঠিত হচ্ছে বড়ো বড়ো বাসকে ভিড় রাস্তায় অসংখ্য নিরপরাধ পথচারীকে পিষে মেরে ফেলার মধ্যে দিয়ে। যেমনটি দেখা গেছে প্যারিসের রাস্তায়। আমেরিকার ৯/১১-এর ঘটনাটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আকাশচুম্বী দুই ইমারতকে নিমেষে উচ্চ শিক্ষিত সৌদি ও পাকিস্তানি পাইলটরা ধ্বংস করে দিয়েছিল। তাতে তিন হাজারেরও বেশি নারী-পুরুষের মৃত্যু হয়। আমাদের মতোই ইংল্যান্ডে টমি রবিনসন বা জায়দা ফ্রান্সেনরা মরিয়া হয়ে এই নরদানবের বিরুদ্ধে আপোশহীন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। এদের ভয়েই নেদারল্যান্ডের গার্ট উইলডার্স গত ১৭ বছর এবং সালমন রুশদি ৩৫ বছর জিহাদিদের 'মৃত্যু পরওয়ানা' থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এই ভয়াবহ বিপদের কথা ইউরোপে হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ডের মতো দেশ বুঝতে পেরেছে। তাই মুসলমান অনুপ্রবেশকে তীব্রভাবে প্রতিহত করছে। বর্মার মতো ক্ষুদ্র দেশ যা করতে পারছে, আমরা ভারতীয়রা কিন্তু রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশিদের অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে অপারগ হয়েছি। কারণ দেশদ্রোহীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা!

ইরাক, ইরান ও মিশরে মাত্র এক থেকে দুই দশকের মধ্যেই সার্থক ভাবে ইসলামিকরণ সম্পূর্ণ হয়! কিন্তু হাজার বছরের প্রতিনিয়ত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আজও ভারত তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছে। ভারতের কাছে আছে প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, খনিজ, প্রাকৃতিক আর আধ্যাত্মিক সম্পদ। আছে দশ হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা ও ঐতিহ্য, অসীম শৌর্য এবং অমিত বীর্য। হ্যাঁ, ভারত পারবে জগৎ সভায় আবার শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে। ইউরোপের ক্ষমতা নেই ইসলামের সঙ্গে একা যুদ্ধ করার। ইসলামের সঙ্গে আমেরিকার লড়াই করার ইচ্ছাশক্তির একান্তই অভাব। তারা চায়, ভারতই তাদের হয়ে করুক লড়াইটা। তাদের হয়ে ভারত যেমনটি গত দুই বিশ্বযুদ্ধে লড়েছে। ভারতের আছে ১.৩৫ বিলিয়ন জনসংখ্যা। বিরাট সৈন্যশক্তি ও সামরিক সামার্থ্য। চীনের সঙ্গে টক্কর দেবার ক্ষমতা আমেরিকা বা জাপানেরও নেই। আছে ভারতের। তাই ভারতকে প্রস্তুতি নিতে হবে উপযুক্ত লড়াইয়ের জন্য।

হ্যাঁ, ভারত পারে বিশ্বব্যাপী এই মহাসংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা নিতে, যদি ভারতকে নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ীপদ দেওয়া হয়। যদি পাকিস্তানের হাত থেকে গিলগিট ও পাক অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতের অভিন্ন অঙ্গ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যদি বালুচিস্তানকে স্বাধীন দেশ ঘোষণা করে, পাকিস্তানকে সিন্ধু, পঞ্জাব ও উত্তরপূর্ব পাখতুনিস্তানে বিভাজিত করতে পারে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান আর চীনের সঙ্গে সীমান্তরেখা সম্বন্ধীয় বিবাদের সমাধান করা যায়, তবে নিশ্চয় ভারত পশ্চিমের আরও একবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া নিতে প্রস্তুত হবে। ■

ভারতের সংসদে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেশদ্রোহের নামান্তর

দেবযানী ভট্টাচার্য

ভারতের সংসদে সপ্তদশ অধিবেশনের প্রথম দিনে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন সাংসদ লোকসভায় ধ্বনি দিলেন 'জয় বাংলা'। এই ধ্বনিটি ১৯৭৯-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবুর রহমানের তোলা বাংলাদেশের ওয়ার ক্রাই এবং আজও এটি সে দেশে আওয়ামি লিগ পার্টির স্লোগান। সেই স্লোগান ইদানীং প্রায়শই উঠছে পশ্চিমবঙ্গেও এবং উঠল ভারতের সংসদেও। একদল ছদ্মবেশী ফেরিওয়ালা পশ্চিমবঙ্গের বুকে ঘুরে বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের একীকরণের স্বপ্ন ফেরি করছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের বুকে তাদেরই প্রিয় স্লোগান হলো 'জয় বাংলা'। এদের বার্তা নিয়েই কি পশ্চিমবঙ্গের একজন সাংসদ পার্লামেন্টে তুললেন সেই স্লোগান? হয়তো অনেকেই অনুমান করতে পারবেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরাই দিয়েছেন এই ধ্বনি।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। ভারতের লোকসভায় বাংলাদেশের স্লোগান তোলা অবশ্যই দেশদ্রোহের শামিল। আমাদের দেশের সংসদে অন্য একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের ওয়ারক্রাই হাঁকবার স্বাধীনতা বাক্‌স্বাধীনতার এক্তিয়ারভুক্ত হওয়া উচিত নয়।

হয়তো কেউ ভাবতে পারেন যে আমাদের রাজ্যের নামও তো 'বাংলা' করতে চেয়েছেন মমতা ব্যানার্জি। তাহলে আমরাই বা 'জয় বাংলা' বলতে পারব না কেন? তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে কিছুদিন পূর্বেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলা' করতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সে নাম অনুমোদন করেনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের যুক্তি অনুসারে, আমাদের রাজ্যের পার্শ্ববর্তী স্বাধীন দেশ বাংলাদেশের নামের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রস্তাবিত নতুন নাম 'বাংলা'র অবিমিশ্র সাদৃশ্য নানা রাজনৈতিক ও নাগরিকত্ব সংক্রান্ত বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে, তাই 'বাংলা' নামটি অনুমোদনযোগ্য নয়। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অনুমোদন না পাওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সমস্ত বিজ্ঞাপনে 'বাংলা' শব্দটিই প্রকটভাবে ব্যবহার



করে চলেছেন। একেও কি দেশদ্রোহী আচরণ বলে ব্যাখ্যা করা যায় না? ভারত সরকারের আপত্তির তোয়াক্কা না করা কি সাংবিধানিকভাবে সমর্থনযোগ্য? অবশ্যই না। অর্থাৎ বাস্তব হলো, মুখ্যমন্ত্রী যতই 'বাংলা', 'বাংলা' করুন, পশ্চিমবঙ্গের নাম আজও 'পশ্চিমবঙ্গ'ই , 'বাংলা' নয়। অর্থাৎ তৃণমূল সাংসদরা যদি সওয়াল করতে চান যে পশ্চিমবঙ্গের নাম 'বাংলা', সেই কারণেই তাঁরা দেশের সংসদে 'জয় বাংলা' ধ্বনি তুলেছেন, তবে সে যুক্তিও ধোপে টিকবে না।

অনেকে হয়তো একথাও বলতে পারেন যে মহারাষ্ট্রীয়রা যদি 'জয় মহারাষ্ট্র' স্লোগান তুলতে পারেন, তবে আমাদের রাজ্যের নাম যাই হোক, আমাদের ভাষা যেহেতু বাংলা, আমাদের এথনিক আইডেন্টিটির সঙ্গে যেহেতু মিশে আছে বাংলা, আমরাই বা 'জয় বাংলা' বলতে পারব না কেন? বাধা কোথায়? বাধা মাত্র একটি। 'জয় বাংলা' ধ্বনিটিকে ইতিমধ্যেই অন্য একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ তাদের নিজেদের ওয়ারক্রাই হিসেবে আপন করে নিয়েছে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কোনো কোম্পানির লোগো বা রেজিস্টারর্ড ট্রেডমার্ক অন্য কোনো কোম্পানি আইনগত বা নীতিগত, কোনোভাবেই ব্যবহার করতে পারে না। যদি করে, তবে বিষয়টি প্রথম কোম্পানির গোচরে এলে প্রথম কোম্পানি দ্বিতীয় কোম্পানির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করতে পারে। নীতিগত দিক থেকে ঠিক সেরকমভাবেই একটি স্বাধীন দেশ অন্য একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের স্লোগানকে ব্যবহার করলে তা অনৈতিক ও গূঢ় রাজনৈতিক দূরভিসন্ধির বার্তা বহনকারী বলে সন্দেহ করার অবকাশ থেকেই যায়। মহারাষ্ট্র কোনোদিন বিভক্ত হয়নি। মহারাষ্ট্রীয়দের কোনো অস্তিত্ব সংকট নেই, যা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙ্গালির আছে। সমগ্র বঙ্গপ্রদেশের ইসলামিককরণ ঠেকাতে বঙ্গভূমির হিন্দু বাঙ্গালির অস্তিত্ব রক্ষার্থেই সৃষ্টি হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটির। সে আত্মরক্ষণযজ্ঞের পৌরোহিত্য করেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থেই পশ্চিমবঙ্গের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা আজও অপরিহার্য। বাংলাদেশের ওয়ারক্রাই 'জয় বাংলা' কোনোমতেই পশ্চিমবঙ্গবাসীর স্লোগান হতে পারে না।

আজকাল পশ্চিমবঙ্গের কিছু সংগঠন এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের এক সুবৃহৎ অংশ, দুই বঙ্গ এক হোক, এমন অতি পরিচিত সেই প্রাচীন ধুয়োটি তুলছেন। তাঁদের প্রচারধারা দেখে বোধ হয় যে তাঁরা যেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই পশ্চিমবঙ্গের স্লোগানকে যেন তেন প্রকারেণ বাংলাদেশের স্লোগানের সঙ্গে এক করার চেষ্টায় মরিয়া। ইদানীং তাঁরা প্রচার করছেন যে 'জয় বাংলা' স্লোগানটি নাকি নেওয়া হয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের একটি কবিতা থেকে এবং নিয়েছিলেন মুজিবুর রহমান। এই দাবির মাধ্যমে তাঁদের মূল প্রতিপাদ্য হলো, নজরুল যেহেতু দুই বঙ্গেরই কবি, নজরুল যেহেতু বাঙ্গালির কবি, তাই 'জয় বাংলা' বলতে এপার বাংলা, ওপার বাংলা, কারুরই নাকি কোনো আপত্তি থাকা উচিত নয়।

তাঁরা তথ্য দিয়েছেন যে, মুজিবুর রহমান এই স্লোগানটি গ্রহণ করেছিলেন নজরুল ইসলামের একটি কবিতা থেকে, যার নাম, 'পূর্ণ অভিনন্দন'। **(তথ্যসূত্র :** https://www.kalerkantho.com/print-editon/doshdik/ 2015/08/261655**)**

এই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে গেলে বলতে হয় যে একথা সত্য যে 'পূর্ণ অভিনন্দন' নামে কাজী নজরুল ইসলামের একটি কবিতা সত্যই আছে এবং 'জয় বাংলা' স্লোগানটি স্বাধীন বাংলাদেশের স্লোগান হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান সত্যই ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু নজরুলের সেই কবিতা থেকেই যে স্বাধীন বাংলাদেশের স্লোগান হিসেবে 'জয় বাংলা' শব্দবন্ধটি নেওয়া হয়েছিল তার



জনগণের টাকায় তৃণমূলের প্রচার।

কোনো প্রামাণ্য রেফারেন্স আছে কি? কেবলমাত্র 'কালের কণ্ঠ' পত্রিকার রেফারেন্সটি নিঃসন্দেহে যথেষ্ট নয়। শেখ মুজিবুর রহমান নিজে কি কোথাও কোনোদিন একথা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে তিনি 'জয় বাংলা' স্লোগানটিকে কাজী নজরুলের 'পূর্ণ অভিনন্দন' কবিতাটি থেকেই নিয়েছেন? বা কাজী নজরুল ইসলাম কি কোথাও একথা বলেছেন (মনে রাখতে হবে 'জয় বাংলা' স্লোগানটি যখন প্রথম ব্যবহৃত হয়, তখন নজরুল জীবিত)? আমি যতদূর জানি, সেরকম কোনো প্রত্যক্ষ প্রামাণ্য নথি সম্ভবত নেই। তবুও, যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিতে হয় যে স্লোগানটি নজরুলের কবিতাটি থেকেই নেওয়া, তাহলে এই নেওয়াটা আদৌ সুপ্রযুক্ত কিনা, নাকি অর্থহীন, তা যথার্থ অনুধাবন করতে গেলে, আগে কবিতাটি পড়তে হবে। তাহলেই বোঝা যাবে যে, মুজিবুর রহমান যে এই কবিতা থেকে দুইটি মাত্র শব্দের একটি শব্দবন্ধ তুলে নিয়ে তাকে স্বাধীন বাংলাদেশের স্লোগান বানিয়েছিলেন, (যদি আদৌ তা করে থাকেন) তবে তা আদতে নজরুলের কবিতায় ওই শব্দ দুইটি যেভাবে, যে উদ্দেশ্যে এবং যে স্পিরিটে ব্যবহৃত হয়েছে তাকে সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘন করেছে।

প্রথমত, নজরুল এই কবিতাটি লিখেছিলেন ১৯২২ সালে, তখন ভারতবর্ষ ভেঙ্গে পাকিস্তানের জন্ম হয়নি। অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশসহ ভারতবর্ষ তখন অখণ্ড। দ্বিতীয়ত, কবিতাটিতে নজরুলের লেখা 'জয় বাংলার পূর্ণচন্দ্র'— এই পঙ্‌ক্তিটির মাধ্যমে নজরুল জয়ধ্বনি দিচ্ছেন পূর্ণচন্দ্র দাস নামক অবিভক্ত ভারতের তথা অবিভক্ত বঙ্গের মাদারিপুরের এক আগ্নেয় বিপ্লবীর নামে। 'জয় বাংলার পূর্ণচন্দ্র' পঙ্‌ক্তিটির অর্থ পূর্ণচন্দ্র দাসের জয়জয়কার। অর্থাৎ এখানে এই কবিতায় 'জয় বাংলা' বলে কোনো শব্দবন্ধের অস্তিত্বই নেই। যা আছে তাহলো, 'বাংলার পূর্ণচন্দ্র'-র জয় ঘোষণা। 'বাংলার' আর 'বাংলা' শব্দদুটি এক নয়। শেখ মুজিবুর রহমান তো আর স্লোগান হিসেবে 'জয় বাংলার' বলেননি। তাই তা থেকে শুধু 'জয় বাংলা' শব্দবন্ধটি তুলে নিয়ে তাকে ভারতবিভাগের পর অবিভক্ত ভারতের টুকরো হিসেবে প্রথমে পূর্ব পাকিস্তান ও পরে স্বাধীন বাংলাদেশের স্লোগান যদি মুজিবুর রহমান বানিয়েও থাকেন, তাহলে বলতে হবে নজরুলের এই কবিতাটির অর্থ মুজিব আদৌ বুঝতেই পারেননি। মুজিবুর রহমানকে অপমান করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই, কিন্তু কিছু মানুষ যখন তাঁকে এতখানি সাহিত্যবোধহীন ও অগম্ভীর বলে প্রচার করতে চাইছেন, তখন আমি নিরুপায়। একথা কোনোমতেই বিশ্বাস্যযোগ্য নয় যে নজরুলের 'পূর্ণ অভিনন্দন' কবিতার সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক একটি পঙ্‌ক্তির একটি অংশ মাত্র গ্রহণ করে তাকে সম্পূর্ণ অন্য অর্থে ব্যবহার করার মতো উপলব্ধিহীন, সাহিত্যবোধহীন, অর্বাচীন ছিলেন না মুজিবুর। কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'কালের কণ্ঠ' এর তথ্যকে যদি সত্য বলে গণ্য করতে হয়, তাহলে একথা না বলে উপায় নেই যে নজরুলের পঙ্‌ক্তি, 'জয় বাংলার পূর্ণচন্দ্র' থেকে 'জয় বাংলা' স্লোগান বানানো মুজিবুর রহমানের (বা অন্য কেউ যদি একথা ভেবে থাকেন, তাহলে তাঁর) দিক থেকেই ছিল হয় আবেগ, নয়তো রাজনৈতিক চাল, নয়তো দুই-ই। মোটের উপর নজরুলের কবিতার স্পিরিট আর স্লোগানের স্পিরিট, দুইয়ের মধ্যে কোনো মিলই নেই।

বাস্তবিক 'জয় বাংলা' স্লোগানের উৎস হয়তো অন্য কোথাও। হয়তো তা মুজিবের নিজেরই আবেগের ফসল অথবা অন্য কোনোখানে। বর্তমানে বোধ হয় অন্য কেউ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে মুজিবের নাম দিয়ে তা চালিয়ে দিতে চাইছেন। কিন্তু যিনি বা যাঁরাই করে থাকুন না কেন, অতিতেই হোক বা বর্তমানে, অপব্যাখ্যা অপব্যাখ্যাই। এবং সন্দেহ হয় যে এই অপব্যাখ্যার আদত উদ্দেশ্য হলো পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙ্গালির নজরুল অনুভূতিতে সুড়সুড়ি দেওয়া যাতে, দুই বঙ্গের একীকরণের নামে পশ্চিমবঙ্গকেও ইসলামের থাবার মধ্যে ঢোকানো যায়। এই উদ্দেশ্যে যে সাংস্কৃতিক অন্তর্ঘাত ও আগ্রাসনের ঘৃণ্য ও বিপজ্জনক চক্রান্ত চলছে, তার স্বরূপ উপলব্ধি করে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সময় এসেছে।

'জয় বাংলা' বলতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তা আমরা কখনোই আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের জয় ঘোষণার জন্য বলতে পারি না। একথা মনে রাখতে হবে যে, যতবার আমরা 'জয় বাংলা' স্লোগানটি উচ্চারণ করব, ততবারই আমরা জয় ঘোষণা করব আমাদের প্রতিবেশী সার্বভৌম বন্ধুদেশ বাংলাদেশের। তাই ভারতের সংসদে দাঁড়িয়ে অন্য কোনো দেশের জয় ঘোষণাকারী এই স্লোগান তোলা অবশ্যই ঘোর অনুচিত, তা সে বন্ধুদেশ যত বড়ো বন্ধুই হোক না কেন।

বিজেপি-তে বেনোজল

রাজনীতিতে দলবদল নতুন নয়। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে একটি দল ভেঙে সমস্ত অচল নেতা আরেকটি দলে আশ্রয় নিলে নেতাদের অতীতের খারাপ কাজের দায় ও দুর্নাম, দুটোই নতুন দলকে নিতে হবে। সঙ্গত কথাই লিখেছেন সরোজ চক্রবর্তী, তাঁর 'বেনোজল শুদ্ধ করতে হলে সংস্কার প্রয়োজন' নিবন্ধে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে দরকারি কথা এটাই যে, বিজেপি কোনও নতুন দল নয়। আজ যাঁরা এই দলে প্রথম সারির পরিচিত মুখ, তাঁরা সকলেই সঙ্ঘ পরিবারের শৃঙ্খলায় বেড়ে উঠেছেন। নতুন যারা যোগদান করছেন, তাদের আর এস এস ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রশিক্ষণ বর্গে অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আগে তারা সুশৃঙ্খল হতে শিখুন, তারপর দলের ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করুন। অন্তত তিন বছর তাদের উচিত স্বয়ংসেবক হিসেবে কাজ করা— তারপর পদপ্রাপ্তি।

দল হিসেবে, বিজেপি আলাদা। এখানে ব্যক্তি নয়, দলীয় সংগঠনই বড়ো। বসন্তের কোকিল বা সুসময়ের সহচর দিয়ে দেশ এগোয় না— শুধু আবেগেও দেশের কাজ চলে না। নির্বাচন-উত্তর পরিস্থিতিতে, কোনও কোনও সংবাদে মনে হয় যেন তৃণমূল-রাজনীতিতে মৌষলপর্ব আরম্ভ হয়েছে। বিক্ষুব্ধ কর্মীরা বিজেপি সেজে ধমক-চমকের থেকে অনেক বেশি কিছুই করছে নিশ্চয়। এসব চলতে পারে না। রাজনীতির অশিষ্টাচার রুখে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে দেওয়া অবশ্যই বিজেপির দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে। শৃঙ্খলাবদ্ধ দল ও সুশিক্ষাই পারে অগ্নিনির্বাপণের জন্য জলের উৎস প্রস্তুত রাখতে।

—নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়,
৬, মধ্যপাড়া, রহড়া,
কলকাতা-৭০০১৯৮।

বর্তমান যুগে আসুরিক মানসিকতা

সাধনা দু'প্রকারের আসুরিক এবং দৈবিক সাধনা। যারা অহংকারের বশবর্তী হয়ে অন্যের অনিষ্টের জন্য, শুধু নিজের জাতির জন্য, সিংহাসনের জন্য সাধনা করে থাকে তাকে আসুরিক সাধনা বলা যায়। নিজের জাতিকেও এরা হাতের মুঠোয় রেখে পুতুলসম নাচিয়ে কুদিয়ে আনন্দ পায় ও তেমনি ভাবে রাখতে চায়। এরা যতই অন্যায় কর্ম করুক না কেন পৃথিবীতে কেউ তার বিরোধিতা করুক তা চায় না। নিজেকে ত্রিলোকের অধীশ্বর হিসাবে ঘোষণা করতে সদা তৎপর থাকে। এরা সাধনার পবিত্র শক্তি কোনো উন্নয়নমূলক কর্মে লাগায় না, শুধু নিজের আভিজাত্য এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রচারে ব্যস্ত থাকে। এই সাধকদের কর্ম যতই কলঙ্কজনক হোক না কেন সদা সর্বদা তারই প্রশংসার আশা রাখে। এরা শক্তির গর্বে সমস্ত জগৎটাকে নিজের খেলার পুতুল মনে করে। নিজের সাধনা শক্তির চেয়ে অন্যেও যে শক্তিশালী থাকতে পারে এমন চিন্তা ভাবনার কথা অহংকারের মোহে বিস্মৃত হয়ে থাকে। দেবতাদের নিকট থেকে বরপ্রাপ্ত করে ভুলে যায় তাদের শক্তি দেবতারা দিয়েছে, সেই শক্তি খণ্ডন করবার শক্তি দেবতাদের হাতে আছে। চোখের প্রখর দৃষ্টিশক্তি থাকা সত্ত্বেও এরা মানসিক অন্ধ হয়ে অবিবেকী নরাধমের মতো জীবন যাপন করতে থাকে। দম্ভ, অহংকার, কামনা, বাসনা, আসক্তি, দর্প এদের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ। অপরের কোনো কর্মের প্রশংসার কথা শুনলে এদের অন্তরে হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। খুব স্বার্থ ছাড়া ইহারা কাকেও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে না। তীব্র স্বার্থের জন্য শ্রদ্ধা ভক্তির অভিনয়ে ভীষণ পারদর্শী। অমর্যাদাজনক হৈ-হুল্লোড় বিচ্ছৃঙ্খলার পরিবেশ এদের প্রিয়।

আসুরিক সাধকরা অত্যন্ত কষ্টকর ভাবে সাধনা করতে পারে। কখনও তাদেরকে হেটমুণ্ড, ঊর্ধ্বপদ হয়ে, কখনও এক পায়ে খাড়া হয়ে, কখনও ঊর্ধ্ববাহু হয়ে, আবার দীর্ঘদিন উপবাসী থেকে তপস্যায় প্রবৃত্ত হতে দেখা যায়। আমাদের ধর্মের বেদ পুরাণে এমন অনেক উপমা পাওয়া যায়। এদের স্বার্থে আঘাত লাগলে নিজের গুরুকেও অবেহলা করতে দ্বিধাবোধ করে না। এই আসুরিক মানব সব সময় অধর্মের পথে অবতরণ করে।



কখনও ভাবে না অধর্মের পথে একদিন বিফলতা আসে বা এসে থাকে। ছল কপটের অনুসরণ করা এদের মানসিক চরিত্রের এক প্রধান অঙ্গ। এরা সাধু-সন্তকে সব সময় ঘৃণা ও অবহেলার চোখে দর্শন করে। যেমন এক জাতীয় কুকুর আছে গেরুয়া বস্ত্রধারী দেখলেই ঘেউ ঘেউ করতে থাকে ঠিক তেমনি এই আসুরিক প্রবৃত্তির মানুষগুলো। তাই গীতায় বলেছে—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু।। ১৬/১৯

এইরূপ দ্বেষপরায়ণ, ক্রূর, নরাধম ব্যক্তিগণকে আমি সংসারে আসুরি যোনীতে বারবার নিক্ষেপ করে থাকি।

আমি বলি বারবার এদের আসুরিক যোনীতে নিক্ষেপ করলে তো আসুরিক মানুষের সংখ্যা জগতে বৃদ্ধি পায় এবং অন্যদের উপর অত্যাচার করতে আরও সুবিধা হয়। অসুর জাতীয় মানুষের শক্তি অপ্রতিহত গতিতে প্রসার হতে থাকে। আসুরিকদের কষ্ট বা শাস্তি দেবার নামে আবার জন্ম দিলে সামাজিক অকল্যাণ তো হবেই, উপরন্তু জগতে দুর্বৃত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আসুরিক লোকেরা ধর্মের নামে যত প্রকার দুর্নীতির পথ অবলম্বন করা যায় তা করছে। একাধিক সংখ্যায় বিবাহ করে সন্তানের জন্ম দিয়ে পশুর মতো পথে প্রান্তরে নিক্ষেপ করছে আর তারা পশুর মতো জীবন ধারণ করে পশু ভাবাপন্ন হচ্ছে ও দুর্বৃত্ত তৈরি হচ্ছে। সেই পৌরাণিক যুগের অসুর, রাক্ষস, দানব জাতি আজ আর নেই কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে তাদের ভূমিকা কোন জাতি বা কারা পালন করছে সে বিচার সমাজের।

—স্বামী বিষ্ণুপদানন্দ,
দ্বারকা, গুজরাট ।

দেশাত্মবোধে ‘বন্দে মাতরম্’ এবং দেশধর্মে ‘জয়শ্রীরাম’

বিরূপেশ দাস

আজ যখন ‘জয়শ্রীরাম’ ধ্বনি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সঙ্গে জনগণের বিবাদ শুরু হয়ে গেছে ঠিক একশো বছর আগে বঙ্কিম সৃষ্ট ‘বন্দে মারতম্’ ধ্বনি ব্রিটিশ শাসকদের নিকট রাজদ্রোহমূলক বলে বিবেচিত হয়েছিল। আজ যখন ‘জয়শ্রীরাম’ ধ্বনি একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট গালগালি তখন এই একশো বছর আগে ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনি ব্রিটিশ শাসকদের মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল। বন্দে মাতরম্ ধ্বনির একটা বিকৃত অর্থ তখন কিছু দেশীয় পুলিশ ব্রিটিশ শাসকদের এবং সিভিলিয়ানদের কর্ণগোচর করেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকরা পরবর্তীকালে এর কোনো সারবত্তা খুঁজে পায়নি। তবে এই ধ্বনি রাজদ্রোহমূলক এই বিষয়ে নিশ্চিত ছিল। ১৯০৭ সালে ১৫ আগস্ট পূর্ববঙ্গ থেকে এক পত্রলেখক লিখেছিলেন তৎকালীন প্রকাশিত ‘ইংলিশম্যান’ পত্রিকায় যে, এখানে ‘ন্যাশানাল ভলিন্টিয়ার’ দলের সমর্থকরা পথে পথে ‘বন্দে মাতরম্’ বলে চিৎকার করে বেড়ায়। এই ধ্বনি শুনে ইংরেজ শাসকরা ঠিক ততবেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং ধর-পাকড় শুরু করে। ১৯০৫ সালে ৭ আগস্ট কলকাতার টাউনহলে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে একটা ঐতিহাসিক সমাবেশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌরোহিত্যে অসংখ্য নর-নারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনি সহকারে সমবেত হয়। এই ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনি লক্ষ লক্ষ মানুষকে সেদিন ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। ১৬ অক্টোবর কার্জন সাহেব বঙ্গভুমিকে দুইখণ্ডে বিভক্ত করার সরকারি সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রতিবাদে জেগে উঠলো বাঙ্গলা। এই উত্তাল আন্দোলনে সেদিন সমগ্র ভারতবর্ষ কেঁপে উঠলো। শ্রীঅরবিন্দ এই জনজাগরণ দেখে লিখলেন—It was thirty two years ago that Bankim wrote his great song and few listend, but in a sudden moment of awakening from delusions the people of bengal looked round for the trouth and in a fated moment somebody sang ‘‘Vande Matram’. The mantra had been given and in a single day a whole people had been to the religion of patriotism. The mother had revealed herself.

অপরদিকে জয়শ্রীরাম ধ্বনি কোথা থেকে কোথায় এসে গেল। এটি বিজেপির কোনো স্লোগান ছিল না। বিজেপির মিছিলে বিজেপির সমর্থকরা দেশভক্তির স্বাজাত্যভিমান বোধে জয়শ্রীরাম ধ্বনি তোলে। প্রাচীনকালে রাজাদের দেশভক্তির জ্বলন্ত উদাহরণ ছিলেন মর্যদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র। ভারতবর্ষের রাজারা এই রাষ্ট্রপুরুষের আদর্শকে সামনে রেখে রাজ্য শাসন করতেন। আজ যাঁরা রাজনীতি করছেন, রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র যে আমাদের সামনে ত্যাগের আদর্শ রেখে গেছেন সেটা অনুসরণ করা কতটা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে সেটা একবার ভেবে দেখার অবশ্যই দরকার। রামায়ণের প্রতিটি ঘটনা — পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র ১৪ বছর বনবাস নিলেন, প্রজানুরঞ্জনের জন্য মাতা সীতাকে ত্যাগ করলেন, যজ্ঞের প্রয়োজনে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করলেন না, ভাই লক্ষ্মণ সব সুখ ত্যাগ করে রামের সঙ্গে বনে গেলেন, ভাই ভরত রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনতে বনে গেলেন কিন্তু দাদা রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনে অনড় থাকায় বিফল মনোরথে ফিরে আসার সময় দাদার পাদুকা মাথায় করে নিয়ে এসে সিংহাসনে রেখে চীরবাস ধারণ করে রাজ্য শাসন করলেন। রামায়ণে এই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা ভারতীয় জনমানসে চির বিরাজমান। মর্যাদাপুরুষ শ্রীরামচন্দ্রকে গোটা ভারতবর্ষ গর্বের সহিত আজও স্মরণ করে। আজ যে জয়শ্রীরাম ধ্বনি পশ্চিমবঙ্গের এক প্রত্যন্ত গ্রামের তিন যুবকের মুখে শুনে একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যিনি আবার নাকি ব্রাহ্মণ কন্যা, তাঁর বিরূপ মন্তব্যে তুলকালাম হয়ে গেল। ছড়িয়ে পড়লো ভারতবর্ষ থেকে গোটা বিশ্বে। এই প্রসঙ্গে রাশিয়ার গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকা-পূর্ব একটা ঘটনা স্মরণযোগ্য। রাশিয়ায় কিছু রামভক্ত রামায়ণ চর্চার অনুশীলন কেন্দ্র তৈরি করে। রাশিয়ার কমিউনিস্ট শাসকরা এই উদ্যোগটা ভালো চোখে নিলেন না। শাসকের নিকট হতে সমস্ত রকম বাধা এলো। নেমে এলো কঠোর নিষেধাজ্ঞা। রামায়ণ অনুরাগীরা রাশিয়ায় শাসকের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তাদের যুক্তি দিল, রামায়ণের কাহিনির মধ্যে অবাস্তবতার কিছু দেখছি না। আমরা রামায়ণের ভিতর যেটা দেখতে পাচ্ছি একটা ত্যাগের পরাকাষ্ঠা যেটা ভোগসর্বস্ব পৃথিবীতে আজ বেশি প্রয়োজন। আরও যুক্তি ছিল— ভাই ভরতের দাদার পাদুকা মাথায় করে বহন করে এনে সিংহাসন রেখে রাজ্যশাসন পরিচালনা করা। এরকম নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরলতম ঘটনা। শোনা যায় রাশিয়ার কমিউনিস্ট শাসক এই যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন। আর আমাদের দেশের এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জয়শ্রীরাম ধ্বনি শুনে গাড়ি থেকে নেমে বলে উঠলেন—‘আমাকে গালাগালি। তোদের সবাইকে দেখে নেবো।’ পুলিসকে নির্দেশ দেওয়া হলো সত্বর তাদের অ্যারেস্ট করার। এরপর এই রাজ্যের জনগণের নিকট কী বার্তা গেল? আমরা কোন রাজ্যে বাস করছি যেখানে স্বাজাত্যবোধে, দেশপ্রেমে এবং দেশধর্মে জয়শ্রীরাম ধ্বনি দেওয়া যাবে না? দেশমাতৃকার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ভক্তির বহিঃপ্রকাশ ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনির উপর ব্রিটিশ শাসনে যে নিষেধাজ্ঞার খড়্গহস্ত নেমে এসেছিল আজ জয়শ্রীরাম ধ্বনির উপর একই সরকারি হস্তক্ষেপ নেমে এসেছে, তারই অশনি সংকেত দেখা যাচ্ছে। রাজ্যবাসীর নতুন করে জেগে ওঠার সময় এসেছে। বস্তুত দেশভক্তির যে ধ্বনি মানুষের হৃদয়ে যে সঞ্চারিত ছিল আজ তা জেগে উঠেছে, তার ছেদ ঘটায় কার সাধ্য! ❙

ছোটোদের কৌতূহলের সমাধান মজার ছলে করতে হবে মা-বাবাকে



নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ একটি শিশু বড়ো হয়ে কোন পথে যাবে, কতদূর এগোবে, এসব কথা কিছুদিন পরে ভাবলেও চলবে। তবে সন্তান জন্মানোর পর থেকেই সেই শিশুর প্রতিটি লক্ষণের ওপর নজর রাখা প্রয়োজন। কারণ তার সুস্থতা, স্বাভাবিকতা সব কিছুই বোঝা যায় একটু খেয়াল রাখলেই। স্বাভাবিক ভাবে আপনার সন্তান হাত-পা ছুড়ছে কিনা, কোনো মজার অঙ্গভঙ্গিতে তার প্রতিক্রিয়া কেমন-- এই দিকগুলি ভালো করে নজরে রাখা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, সন্তানের সঙ্গে ওর ছোটো বয়স থেকেই ভালো ব্যবহার করতে হবে। অনেকেই ভেবে থাকেন ছোটোরা হয়তো তেমন কিছু বোঝে না, তাদের সামনে যা ইচ্ছা করা যায়। কিন্তু ছোটোদের মধ্যেও আবেগ কাজ করে। তাই ওকে খাওয়ানো থেকে ঘুম পাড়ানো সবের মধ্যের যেন আপনার আদর, ভালোবাসা মেশানো থাকে। এমনকী পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে আপনি কেমন ব্যবহার করছেন, তার প্রভাবও কিন্তু আপনার ছোট্ট সন্তানের ওপর গিয়ে পড়ে।

ছোটোদের কাছে পৃথিবীটা একেবারে নতুন। সবটাই ওদের অজানা। যা-ই দেখবে, যা নতুন শিখবে সবের প্রতিই ওদের একটা কৌতূহল জন্মাবে। আর এই শেখা আরও সহজ হবে যদি আভিভাবকরা মজার ছলে তাদের সব প্রশ্নের সঠিক সমাধান করে দিতে পারেন। ছোটো থেকেই আপনার সন্তানকে কিছু শেখানোর সময় নিজে পজেটিভ থাকুন। তার প্রথম অবাক হয়ে দেখা, আনন্দ পেলে হাসা, খারাপ লাগলে বা ভয় পেলে সরে যাওয়া সবই তার মস্তিষ্কের কোষগুলিকে সংবেদনশীল করে তোলে। শেখার সময় নতুন কিছু তাকে বলা হলে তা তার মস্তিষ্কের কোষে গিয়ে জমা হয়। শুধু শেখানো জিনিসটি নয়, যে পদ্ধতিতে শেখানো হয় তাও তার মনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। তাই কোনো কিছু শেখানোর সময় চেষ্টা করুন মুখে হাসি ধরে রাখতে। মা-বাবার মুখে হাসি দেখলেই খুদেটি সাহস পাবে। ভুল করলেও মা-বাবার মুখে হাসি দেখে সে শুধরে নিতে পারবে অনায়াসেই।

ছোটোরা সবসময়ই খেলার ছলে সব কিছু শিখতে পছন্দ করে। তাই ছোটো থেকেই ওদের কিছু শেখানোর জন্য খেলার সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারেন। এতে যেমন ওরা উৎসাহ পাবে, তেমনি খেলার আগ্রহও বাড়বে। ওদের আনন্দ ও আগ্রহ সৃষ্টির জন্য নতুন নতুন কিছু আবিষ্কারের কথা ভাবুন। ছোটোরা অনেক সময় কাদা-মাটি নিয়ে খেলাধুলা করলে আমরা রাগারাগি করি, ওদের বকাঝকা করি। এমনটা করা ঠিক নয়। বরং ওদের ওভাবেই খেলতে দিন।। এভাবেই তো

অঙ্গনা

ছোটোরা নতুন নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারবে। তবে তারই মধ্যে শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখতে ভুলবেন না। খেলাধুলার পর ভালো করে হাত-মুখ ধোওয়ার অভ্যাস করালেই ওরা সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে ঢুকে যাবে। এখন বিভিন্ন ছাঁচে অক্ষরের তালিকা পাওয়া যায় প্রথম অক্ষর জ্ঞান করানোর সময় সেই ধরনের ব্লক দিয়ে ওদের অক্ষর জ্ঞান করানো যেতে পারে। পশু-পাখির নাম শেখানোর সময় ছবি দেখিয়ে শেখালে ওদের মাথায় তা খুব পরিষ্কার ভাবে ঢুকে যাবে। কখনো ভুলবে না। ছেটোদের খেলার জন্য নানারকম উপকরণ পাওয়া যায়, যেগুলো দিয়ে ওরা বিভিন্ন জিনিস বানাতে পারে। সেগুলো কিনে দিন। এগুলোতেও ওদের মস্তিষ্কের বিকাশ হবে।

বিদেশে বাচ্চাদের অনেক ছোটো থেকেই বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা আছে। মাত্র এক বছর বয়স থেকেই ওদের সাঁতার শেখানো হয়। শুনতে অবাক লাগলেও এটা সত্যি। শুধু তাই নয়, বাচ্চা যখন একটু বসতে পারে তখন থেকে বিভিন্ন ছবির বই, ছোটো ছোটো গল্পের বই কিনে এনে ওদের হাতে দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে মা-বাবারা সেই বই দেখিয়ে বাচ্চাকে গল্প পড়ে শোনান কিংবা ছবি দেখিয়ে যেকোনো এক বিষয়ের সঙ্গে শিশুকে পরিচিত করান। আর সেই কারণেই বিদেশের বাচ্চারা অনেক ছোটো থেকেই স্বাবলম্বী।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা গেছে, একটি সদ্যোজাত শিশুর কান্না কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না। তারপর শিশুটির বাবা তার কাছে গিয়ে গুন গুন করে গান গাওয়ার পর তার কান্না থেমে গেল। এভাবেই বাচ্চার ঘুমানোর সময় মা-বাবা নিজের জানা গানগুলো শোনাতে পারেন। হালকা সুরের গান শিশুর মস্তিষ্কের কোষগুলিকে আরাম পেতে সাহায্য করে। এর ফলে সারাদিন হুটোপুটি করা শিশুটি শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। মনে রাখতে হবে, আপনার শিশু আপনার ভবিষ্যৎ।

(সৌজন্যে দৈনিক সংবাদ, আগরতলা)

হিং ও কর্পূর মহা উপকারী ভেষজ

অসিতবরণ আইচ

হিং

● বাঙ্গালি পরিবারে হিঙের প্রচলন একটু কম। অনেকে এর গন্ধ সহ্য করতে পারেন না। অনেকে আবার এর গন্ধে পাগল।

● হিং মানেই হিঙের কচুরি, এমনটাই অধিকাংশ বাঙ্গালির ধারণা। অত্যন্ত উপকারী এই হিঙের ঔষধীয় গুণ শুনলে আশ্চর্য হতে হয়।

● এর সংস্কৃত নাম হিঙ্গু। এই হিঙ্গু গাছের আঠাই হলো হিং। তবে অনেক ফালতু জিনিস মিশিয়ে আমাদের সামনে আনা হয়।

● খাঁটি হিং ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা কিলো হবে।

● আগে তো সুদের ব্যবসায়ী কাবুলিওয়ালাদের দেখতাম ছোটো বাক্স নিয়ে হিং বেচতে। বর্তমানে প্রায় সব মুদিখানা দোকানেই পাওয়া যায়।

● দুপুরের রান্নায় খাওয়ার চেয়ে সকালে ও রাত্রে হিং খাওয়া ভালো।

● হিঙের খুব সুনাম আছে পেটের বায়ুকে নীচের দিকে ঠেলার। অর্থাৎ বায়ুর অনুলোমন ঘটায়। যাঁরা ঊর্ধ্ববায়ু রোগী তাঁদের পক্ষে হিং মহৌষধ।

● গরম জলে হিঙের গুঁড়ো মিশিয়ে ঠাণ্ডা করে খেলে রক্তে গ্লুকোজ কমায়। ক্যান্সার প্রতিরোধ করে।

● ভাজা হিং গরমজলে গুলে খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। কৃমিও কমে।

● হিঙের জল ব্লাডার ও কিডনি পরিষ্কার করে।

● হিঙের জল রক্তাল্পতা কমায় ও হাঁপানি দূর করে। অ্যাসিডিটি কমায়।

● হিং হৃদরোগের মহৌষধ। মল নিঃস্বারক ও রক্তশোধক।

● রান্নাকে সুগন্ধ ও সুস্বাদু করে, সহজপাচ্য করে।

● রক্তের উচ্চচাপ রোগীদের অবশ্যই হিং খাওয়া উচিত। হিং ব্লাডপ্রেসার নিয়ন্ত্রিত রাখে।

● মাইগ্রেন ও মাথাব্যথা কমায় হিঙের জল।

● হাড় শক্ত করে হিং। শিশুদের হিং-মিশ্রিত সরষের তেল গায়ে মাখালে শিশুর হাড় খুব শক্ত হয়।

● হিং খিদে বাড়ায় আবার খাবার পর হিঙের গুলি খেয়ে খাদ্য সহজে হজম হয়।

● যারা পিঁয়াজ-রসুন খান না, তারা আদার সঙ্গে হিং ফোড়ন দিয়ে রান্না করে খান।

● আদা মধু হিং মিশিয়ে খেলে কাশি শ্বাসকষ্ট দূর হয়।

● যৌন আগ্রহ বৃদ্ধি করে। গোলমরিচ ও হিং সমপরিমাণে নিয়ে রোজ এবং চিমটি করে খেতে হয়।

● ঋতুকালে পর্যাপ্ত স্রাব হচ্ছে না, হিঙের জল খেলে ঠিকমতো উচিত পরিমাণে স্রাব হবে।

● হিং-ভাজা চূর্ণ দাঁতের গোড়ায় দিলে ব্যথা থাকে না।

● হিং বায়ু ও কফনাশক।

● লেবুর সঙ্গে হিং মিশিয়ে খেলে দাঁতের সমস্যা দূর করে।

● সোয়াইন ফ্লু থেকে মুক্তি মেলে হিং খেলে।

কর্পূর

● কর্পূর হলো গাছের আঠা। খাঁটি কর্পূর দুর্লভ। কর্পূরের গন্ধবিশিষ্ট অন্যান্য গাছের নির্যাস মেশানো কর্পূর বাজারে বেশি। তারপর সেন্ট মেশানো কর্পূর তো আছেই।

● কর্পূর শুধু পূজার্চনার বস্তু নয়। মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় একটি বস্তু।

● কর্পূর জ্বালালে পরিবেশ শুদ্ধ হয় কর্পূরের গন্ধে। এছাড়া ঘরের কোণে কোণে কর্পূর রাখলে ঘরের ভ্যাপসা গন্ধ দূর হয়।

● মুখে ঘা জিভে ঘা কর্পূর জলে গুলে সেই জলে কয়েকদিন মুখ ধুলে সেরে যাবে।

● চুলে খুসকি—জলে কর্পূর মিশিয়ে মাথা ধুতে হবে।

● খড়িমাটির সঙ্গে কর্পূর মিশিয়ে ভালো দাঁতের মাজন হয়। দাঁত ঝকঝকে হয়।

● জ্বরে সর্দিতে কর্পূরের তেল বুকের পাঁজরে গলায় মালিশ করতে হয়। ৫০ গ্রাম সরষের তেলে ২০ গ্রাম কর্পূর মিশিয়ে নিতে হবে।

● বাথরুমে কর্পূর রাখলে বাথরুম সুগন্ধিত হয় এবং জ্যোতিষ মতে বায়ুদোষ কাটে।

● রুপোর বাসন ও অলংকার যে আলমারিতে থাকে সেখানে কিছুটা কর্পূর রেখে দিলে রুপোর ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় না।

● পানীয় জলে কিছুটা কর্পূর মিশিয়ে দিলে জল শুদ্ধ ও সুগন্ধিত হয়।

● দেবদেবীর পূজায় হোমে কর্পূরের ব্যবহার আবশ্যিক।

● কর্পূর ভেজানো জলে কাচ পরিষ্কার হয়।

● গাছের গোড়ায় দেওয়া মাটির মধ্যে যদি কিছু কর্পূর মিশিয়ে দেওয়া যায়, তবে সেই মাটিতে পোকা হবে না।

● গরম জলে কর্পূর মিশিয়ে পা চুবিয়ে রাখলে ফাটা গোড়ালি ভালো হয়।

● নারকেল তেলে কর্পূর মিশিয়ে মুখে ও গায়ে মাখলে ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়।

● অল্পবয়সে চুল পড়ে যাচ্ছে—কর্পূর তেল মাথায় মাখলে কাজ হবে।

● মাথা ধরা, মাথা ব্যথায় কর্পূর তেল অত্যন্ত লাভদায়ক।

রুই কাতলারা সাধু আঁশবঁটিতে চুনোপুঁটিরা

সন্দীপ চক্রবর্তী

ঠেকায় পড়লে মানুষ এমন অনেক কাজ করে বা করতে বাধ্য হয় যা স্বাভাবিক অবস্থায় তার কাছে অপ্রত্যাশিত। সাধারণ নির্বাচনে বিজেপির কাছে পর্যুদস্ত হবার পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তেমনই এক কাণ্ড বাধিয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন, তার দলের নেতা-কর্মীরা কাটমানি খায়। তাঁর হুকুম, যারা কাটমানি খেয়েছেন অবিলম্বে তা সাধারণ মানুষকে ফেরত দিতে হবে। বলা বাহুল্য এমন একটি নির্দেশ মমতার কাছে অপ্রত্যাশিত। কারণ, কিছুদিন আগে চুঁচুড়ায় এক সভামঞ্চ থেকে মমতাই বলেছিলেন, দলের কর্মীরা যে অর্থ সংগ্রহ করবেন তার ৭৫ শতাংশ পাবে দল। বাকি ২৫ শতাংশ পাবেন আদায়কারী। বলা বাহুল্য, মমতার কাটমানি ফেরত দেওয়ার নির্দেশে গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে এই ২৫ শতাংশ পকেটস্থ করা নীচু তলার নেতা-কর্মীরা।

প্রশ্ন উঠতে পারে মমতা এমন একটা নির্দেশ কেন দিলেন? তিনি কি জানতেন না এর ফলে তাঁরই দলের কর্মীরা জনরোষের মুখোমুখি হতে পারেন? বস্তুত, স্বাধীনোত্তর কালে তৃণমূল সরকারের মতো এমন নৈরাজ্যবাদী অগণতান্ত্রিক এবং দুর্নীতিগ্রস্থ সরকার পশ্চিমবঙ্গ দেখেনি। তৃণমূল দল এবং সরকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি। প্রসঙ্গত একটা কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, বামফ্রন্ট আমলে যে সামাজিক দুর্বৃত্তায়ন শুরু হয়েছিল সেটাই চরম পরিণতি লাভ করেছে তৃণমূল আমলে। একথা সকলেই জানেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম কংগ্রেসের আঁতুড়ঘরে হলেও তাঁর রাজনৈতিক ডিএনএ আলাদা। তিনি বামপন্থী ঘরানার রাজনীতিবিদ। সিপিএমের মতো তিনিও রাজ্যকে প্রথমে বিরোধীশূন্য করার কথা ভেবেছেন। উদ্দেশ্য, তাঁর সরকার হাজারো দুর্নীতি করলেও যাতে স্রেফ কোনও রাজনৈতিক বিকল্প না থাকার কারণে মানুষ বারবার তাঁর দলকেই ভোট দেন। ২০১১ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত এই উদ্দেশ্য পূরণে মমতার কোনও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু এবারের সাধারণ নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী সব হিসেব উল্টে দেন। বিভিন্ন জনসভায় তিনি বারবার তৃণমূলের দুর্নীতির দিকে ইঙ্গিত করেন। শুধু তাই নয়, তৃণমূল সরকারকে 'তোলাবাজের সরকার', 'জগাই মাধাই সরকার' এবং খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'স্পিডব্রেকার দিদি' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পাথরচাপা ক্ষোভ উসকে দেন। এর ফল কী হয়েছে তা আজ আর কারোও অজানা নয়। মানুষ যেমন নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে একজন সর্বমান্য নেতাকে খুঁজে পেয়েছে ঠিক তেমনি বিজেপি হয়ে উঠেছে সম্ভাব্য রাজনৈতিক বিকল্প। বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গের এহেন পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাধ্য করেছে কাটমানি ফেরত দেবার মাধ্যমে নিজের এবং নিজের দলের ভাবমূর্তি মেরামত করবার কাজে মন দিতে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। কাটমানি বাবদ কত টাকা সরকারি কর্মী অফিসার এবং তৃণমূলের কর্মীরা খেয়েছেন? অন্তত কোনও একটি অর্থবর্ষকে ভিত্তি করে আমরা একটা সম্ভাব্য টাকার অঙ্কে পৌঁছতেই পারি। মনরেগা প্রকল্পের কথাই ধরা যাক। সরকারের দাবি, ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ২১.৬৪ কোটি মানুষকে একশো দিনের কাজ প্রকল্পে কাজ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে যে কাটমানি চলে তার প্রমাণ বীরভূমের মল্লারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে কাটমানি ফেরত দেবার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছেন ওখানকার মানুষ। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ইন্দ্রনীল দাশগুপ্তের মতে, সরকারের দেওয়া তথ্য ভিত্তি করে বলা যায়, শুধু ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পেই ৩০ হাজার কোটি টাকার কাটমানি দেওয়া-নেওয়া হয়ে থাকতে পারে। এরপর আছে বাঙ্গলার আবাস যোজনা (সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাঙ্গলা সংস্করণ) এবং স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর প্রকল্প। দুটিতেই ১০ শতাংশ করে কাটমানি দেওয়ার নিয়ম। মূলত এই তিনটি প্রকল্পেই সর্বাধিক কাটমানি চলে। এবং সেই টাকায় ভাগ বসান তৃণমূলের নীচের তলা থেকে ওপরের তলার তাবৎ নেতা-কর্মী ও মন্ত্রীরা।

তৃণমূলের সাংসদ শতাব্দী রায় যথার্থই বলেছেন। তাঁর মতে, কাটমানি নেওয়া হয় চেন সিস্টেমে। ফেরতও দেওয়া উচিত সেইভাবে। এরকম যেন না হয় নীচের তলার কর্মীরা টাকা ফেরত দিলেন আর তাতে ওপরতলার রেট আরও বেড়ে গেল! কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? তৃণমূলে এখন রুইকাতলারা সাধু, চোর শুধু চুনোপুঁটিরা। ঠেকায় পড়ে এদের আঁশবঁটির মুখে ফেলে দিলে দলটা বাঁচবে তো? দল না বাঁচলে কিন্তু সিংহাসন বা রাজমুকুট কিছুই থাকবে না।



মাননীয়া আপনার রাজনৈতিক বেলুন ফুটো হইয়া গিয়াছে

সুজিত রায়

মাননীয়া,

মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়া সমীপেষু,

আপনাকে এই খোলা চিঠি লিখিবার উদ্দেশ্য হইল আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। ধন্যবাদ মূলত দুটি কারণে। প্রথমত, দীর্ঘ ৮ বছর পরে আপনার কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙিয়াছে (সম্ভবত তোষামোদীদের পক্ষ হইতে আপনার নাসিকায় সরিষার তৈলের সরবরাহের স্বল্পতায়)। দ্বিতীয় কারণ, দেরিতে হইলেও, আপনি দীর্ঘ ঘুমের ঘোর কাটাইয়া কিছু কিছু বিষয় স্পষ্ট দেখিতেছেন।

যেমন, আপনি রাজ্যের বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার প্রবীণ মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেখিতে পাইয়াছেন— আপনার দলের প্রিয় ভাইসকল কাটমানি খাইয়া লাল হইয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ বামফ্রন্টের লাল জমানার দিনগুলির মতোই দলীয় কর্মীরা রাজ্যের বিবিধ প্রকল্প হইতে 'নিজস্ব কমিশন' খাইতে খাইতে এমন পর্যায়ে পৌঁছাইয়া গিয়াছেন যে আপনাকে নিজ মুখে বলিতে হইতেছে, 'যাহারা কাটমানি খাইয়াছেন, অবিলম্বে তাহা ফেরত দিন।' এবং দেখা যাইতেছে সেই কাটমানি ভোজনরসিকদের মধ্যে আপনার অতি প্রিয়পাত্র ডাঃ শান্তনু সেনও অভিযুক্ত হইয়াছেন। শোনা যাইতেছে, তাঁহার নামে বেনামে এখন নগদ এবং সম্পত্তিতে আর্থিক মালিকানার পরিমাণ সহস্র কোটি বা প্রায় সহস্র কোটি। এবং আপনার মুখনিঃসৃত কাটমানি তথ্য জনসমক্ষে প্রতিভাত হইতে না হইতেই এরাজ্যের তৃণমূলি রাজনীতির খোঁয়াড়ে শোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। প্রায় প্রতিদিনই শহর কলকাতা হইতে শুরু করিয়া সুদূর গ্রামাঞ্চলের দারা সিংহ-সম তৃণমূলি নেতৃত্বকে হয় জনরোষের মুখোমুখি হইয়া চড়-থাপ্পড় খাইতে হইতেছে। নয়তো পৃষ্ঠদেশের চামড়া বাঁচাইতে দেশত্যাগী হইতে হইতেছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের এ বড়ো দুঃসময় এবং এই দুঃসময়ের রচয়িতা আপনি স্বয়ং। স্বহস্তে আপনি আপনার নিজস্ব 'সততার প্রতিমূর্তি' ইমেজটুকুকে ফিরাইয়া আনিবার তীব্র তাগিদে আপনার কর্মীবাহিনীর জন্য রাজ্য জুড়ে অজস্র কফিন তৈয়ারি করিয়া দিয়াছেন। ইহা কম কথা নহে।

আপনি দিব্যদৃষ্টির অধিকারি নহেন, তাহা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। আপনি রাজ্যব্যাপী জনসমাবেশগুলিতে যতগুলি রাজ্যে বিজেপি শূন্য অথবা রসগোল্লা পাইবে বলিয়া ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন, তাহা ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। আপনি নিজ রাজ্যে ৪২টি আসনের ৪২টিতেই জিতিবেন বলিয়া নয়া নস্ট্রাদামুস সাজিয়া



মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়া, আপনার ফোলানো ফাঁপানো রাজনৈতিক বেলুন ফুটো হইয়া গিয়াছে। এখন আপনি যতই তাপ্পি মারিয়া তাহাকে ফোলাইতে চাহেন, পারিবেন না।... দিন সমাগত। তৈরি হউন।

বাজিমাত করিতে চাহিয়াছিলেন। আপনি মাত্র ২২টি আসনে কোনোক্রমে জিতিয়াছেন। অর্থাৎ প্রমাণিত হইয়াছে, আপনি জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ নহেন। রাজনীতির চাণক্যও নহেন।

তবে, আমরা জনগণ খুশি যে আপনার নিদ্রা বিলম্বে ভাঙিলেও আপনি ঘুমঘোর লাগা চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পাইতেছেন, গোটা রাজ্যটি আপনার রাজনৈতিক ঘরানার ফলে রসাতলে গিয়াছে। এখন রাজ্যটিকে বাঁচাইতে হইলে প্রয়োজন ভেন্টিলেশন মেশিন। স্যালাইনে কাজ হইবে না। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়া, আপনার স্মৃতির দরজায় একটু টোকা মারিতে চাই আজ। আপনি নিশ্চয় মানিয়া চলেন যে স্মৃতি সততই সুখের। প্রতিটি সজ্জন ব্যক্তিই তাহা বিশ্বাস করেন। কিন্তু আজ আমি স্মৃতির সিন্দুক খুলিয়া আপনাকে যাহা স্মরণ করাইব, তাহা বড়ো দুঃখের। রাজ্য রাজনীতির রানি হইয়া ক্ষমতার তখতে বসিবার অব্যবহিত পরেই যখন আপনার অতি নিকট পার্ষদবর্গ সারদা চিটফান্ড কাণ্ডে অভিযুক্ত হইয়া ফাঁসিয়া গেল, তখন আপনি সগর্বে বড়ো বড়ো চোখ পাকাইয়া বলিয়াছিলেন— ''আমি চোর? মুকুল চোর? মদন চোর? কুণাল চোর?'' অভিযোগের জবাবে আপনার নির্দেশে তৃণমূলি কর্মীরা বিশাল মিছিল বাহির করিয়াছিল। প্রত্যেকের গলায় ঝুলিয়াছিল প্ল্যাকার্ড— 'আমরা চোর?' সেদিন আপনি অভিযোগকারীদের ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস লক্ষ্য করুন— আজ আপনি নিজেই বলিতেছেন— আপনার দলের সবাই চোর। অথবা চোরের চাইতে একটু বেশি— ডাকাত। ছিনতাইবাজ। ঠগবাজ। ৪২০। কারণ গোটা রাজ্য জুড়িয়া কাটমানির কুটির শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছেন আপনার হাতে মানুষ আপনার ভাইসকল। ইহা আপনার অজানা নহে। তাই চুঁচুড়ায় এক প্রশাসনিক সভায় প্রকাশ্যে আপনি দলীয় কর্মী ও বিধায়কদের কাটমানির ৭৫ ভাগ দলকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেকথা আপনি নিশ্চয়ই ভোলেন নাই।

মাননীয়া, ধৃষ্টতা মাফ করিবেন। সত্যি কথা বলিতে কী— শুধু পাতানো ভাইয়েরাই নয়— এই কুটির শিল্পের সহযোগী হিসেবে অভিযোগ

উঠিয়েছে আপনার আপন মায়ের পেটের ভাইসকল— ওই কার্তিক, গণেশ প্রমুখ এবং অবশ্যই আপনার সাধের লাউ, সরি, সাধের ভাইপো অভিষেক যাহাকে আপনি রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অভিষেক পর্ব প্রায় সমাপ্ত করিয়াই রাখিয়াছেন। আপনার দল ত্যাগ করিয়া এবার বিজেপির সাংসদ হইয়াছেন যে সৌমিত্র খাঁ, তিনি তো প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়িয়াছেন যে তিনি প্রমাণ করিবেন, আপনার ভাইপোর কাছে প্রতি মাসে রাজ্যের কয়লা খনি অঞ্চল থেকে কুড়ি লক্ষ টাকা নজরানা প্রেরণ করা হয়। বালিখাদান আর সিন্ডিকেট রাজগুলির পক্ষ থেকেও কয়েক লক্ষ প্রতি মাসে। এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন— এসব অর্থ পাচার করিতেই অভিষেকবাবুর বিদেশিনী স্ত্রীকে ঘনঘন ব্যাঙ্কক যাইতে হয়— মাসে একুশ বার!

শুধু তাহাই নহে— কালীঘাট অঞ্চলে প্রোমোটারির সেলামি বাবদ আপনার সহোদরবর্গ ও ভাইপোর আয় Leaps & Bounds সংস্থার মতোই লাফাইয়া লাফাইয়া বাড়িয়াছে, গোটা হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে যে তারা দখলীস্বত্ব জারি করিয়াছে— তাহাও আপনার অজানা নহে। কিন্তু আপনি সেগুলি দেখিতে পাইতেছেন না। আপনার চামচা সাংবাদিক বাহিনীর অন্যতম এক সদস্য 'আনন্দ'-এর সহিত টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে প্রশ্নটি আমতা আমতা করিয়া তুলিলেও, আপনি বলিয়াছেন— ওসব ব্যক্তিগত বিষয়ে আপনি নাক গলাইতে চাহেন না। যুক্তিটি রাজ্যের মানুষের বোধগম্য হয় নাই। কাটমানি খাইয়া যদি রাজ্যের কোনো এক গ্রামের গ্রামসভা সদস্য পুলিশি হেফাজতে যাইতে পারে, যদি তৃণমূলি কর্মীর ঘর বাড়ি জ্বলিতে পারে, যদি তৃণমূলি কাউন্সিলিদের পিঠের চামড়া গুটাইয়া দিবার জন্য সশস্ত্র জনগণ তাহার বাড়িতে হাজির হইয়া যান, তাহলে আপনার নিজস্ব ভাই-ভাইপোদের বিরুদ্ধে কাটমানি খাওয়ার অভিযোগ 'ব্যক্তিগত বিষয়' কেন হইবে? এ প্রশ্নের জবাব তো আপনাকেই দিতে হইবে।

মোদ্দা কথা হইল, আপনি পুনরায় নাটক করিতেছেন। ভোটে প্রায় রাজ্যপাট যাইবার মুখে আপনি এখন পুনরায় 'সততার প্রতিমূর্তি'র ছৌ মুখোশ পরিয়া সৎ সাজিতে চাহিতেছেন যাহাতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ আপনার প্রতি ভক্তিতে গদগদ হইয়া পুনরায় ভোট দেয়। যাহাতে জনগণ পুনরায় আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয় এবং আপনার শিয়রে শমন সম বিজেপির রাজনৈতিক নিঃশ্বাস দূরীভূত হইয়া যায়। তাহা যদি না হয় তাহলে পাতানো ভাইয়ের



কাট মানি নিয়ে বিধানসভায় বিরোধীদের প্রতিবাদ।



বীরভূমের চাতরায় কাট মানি ফেরত পেয়ে খুশি গ্রামবাসীরা।

কাছে কাটমানি ফেরতের নির্দেশ জারি করিতে পারেন, নিজের সহোদর ও ভাইপোকে কেন বলিতে পারেন না? কেন একবারও ঘাড় পাতিয়া স্বীকার করেন না যে আগে যাহা বলিয়াছিলাম, 'আমি চোর? মুকুল চোর? মদন চোর? কুণাল চোর?', তাহা ভুল বলিয়াছিলাম। কেন একবারও স্বীকার করেন না, আপনার দলের রমরমা সাদা পথের উপার্জনে নয়। সাধারণ মানুষের ঘাম-রক্ত অশ্রু মেশানো চিটফান্ডের টাকায়? ইহার পরেও কোন মুখে কহিতেছেন, দলের ৯৯.৯৯ শতাংশ নেতা-কর্মীই সৎ? ইহাই কি আপনার সততা?

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়া, আপনার ফোলানো ফাঁপানো রাজনৈতিক বেলুন ফুটো হইয়া গিয়াছে। এখন আপনি যতই তাপ্পি মারিয়া তাহাকে ফোলাইতে চাহেন, পারিবেন না। একদিন দেখিবেন, আপনার প্রিয় ফিরহাদ হাকিম, শুভেন্দু অধিকারী, পার্থ চট্টোপাধ্যায়- সহ সকলেই আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে যেমন আজ রাজ্যের দিকে দিকে বিদ্রোহ চলিতেছে পুলিশের নেতৃত্বে। আপনার পাশে আজ অধ্যাপকরা নেই, সরকারি কর্মচারীরা নেই, বেকাররা নেই, শিক্ষকরা নেই, ছাত্ররা নেই, অভিভাবকরা নেই, আইনজীবীরা নেই, ব্যবসায়ীরা নেই, কৃষক নেই, সর্বোপরি গরিব খেটে খাওয়া মানুষ নেই। আর কদিন বাদে, আপনার দলীয় কর্মীরাও পাততাড়ি গুটাইবেন। কারণ সকলেই কাটমানি খাইয়াছেন পেট ভরিয়া এবং টানা ৮ বছর ধরিয়া, ইহারা দেখিবেন— সকলেই প্রস্তুত হইতেছেন 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি তুলিয়া আপনার 'কাটমানি'র তথ্য ফাঁস করিয়া দিতে। দিন সমাগত। তৈরি হউন। শেষের সেদিন ভয়ংকর। মুষলপর্ব শুরু হইয়া গিয়াছে। রাজবংশের পতন অবশ্যম্ভাবী। ■

পচন তো ধরেছে মাথাতেই

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

শুরুটা হয়েছিল পাড়ার মোড়ে 'সততার প্রতীক' কাটআউট টাঙিয়ে। ভাবখানা এমন ছিল যেন স্বর্গের দেবদূতদের আসর থেকে পশ্চিমবঙ্গে সেই প্রথম কোনো সততার প্রতিমূর্তি নেমে এলেন। তাঁর আগে এ রাজ্যে আর কোনো সৎ রাজনীতিকের জন্ম হয়নি। অথচ তিনি, মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনীতির আঙিনায় পা রাখার আগেই এখানকার মানুষ ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, অজয় মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, ত্রিদিব চৌধুরী, অতুল্য ঘোষ, প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরিপদ ভারতী প্রমুখ রাজনীতিককে দেখে ফেলেছেন। এবং এও দেখেছেন, এই আদ্যন্ত সৎ রাজনীতিকরা নিজেদের নামের পাশে 'সততার প্রতীক' উল্লেখ করে প্রচারে নামেননি। রাজ্যের রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম রাজনীতিক, যিনি 'সততার প্রতীক' কাট আউট টাঙিয়ে নিজের সততাকে প্রচার করতে নেমেছিলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নিজের সততাকে এমনভাবে বিপণনযোগ্য করে তোলেন কারা? তারা কি প্রকৃত অর্থেই সৎ, নাকি তাদের সততা একটি ভানমাত্র? বলতেই হচ্ছে স্বঘোষিত 'সততার প্রতীকরা আসলে নিজেদের দুষ্কর্মগুলি ঢাকতেই সৎ সাজার ভান করেন। ভান করেন নিজেদের অন্ধকার দিকটি আড়াল করার জন্য। সততার প্রতীক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালো দিকটি উদ্ঘাটিত হতেও বেশি দিন সময় লাগেনি অবশ্য। 'সততার প্রতীক' কাট আউট টাঙিয়ে প্রচার করার কিছুদিন পরেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডক্টরেট ডিগ্রিটি আসলে জাল। এটি প্রমাণ হয়ে যাওয়ার পরে অবশ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নামের আগে 'ডক্টর' যেমন ব্যবহার করেননি, তেমনই সততার প্রতীক কাটআউট টাঙিয়ে প্রচারটাও বন্ধ করেছেন।

এখন এত বছর পর, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আট-আটটি বছর অতিক্রম করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবার দেখা যাচ্ছে সৎ সাজার ভান করতে। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের বিপর্যয়ের পর এখন মমতা বলতে শুরু করেছেন তাঁর দলের যারা কাটমানি খেয়েছেন, তাদের কাটমানির টাকা ফেরত দিতে হবে। মমতার এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জেলায় জেলায় তার দলের ছোটো, বড়ো, মেজো নেতারা স্থানীয় মানুষের হাতে ঘেরাও হচ্ছেন। কাটমানি ফেরানোর দাবি জোরদার হয়ে উঠেছে। কাটমানি ফেরত দিতে বলে মমতা এমন ভান করেছেন, যেন তিনি বিষয়টি কিছুই জানেন না। হঠাৎ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে তিনি বিষয়টি মেলেছেন। আসলে সৎ সাজার ভান করে তিনি নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে আড়াল করতে চাইছেন। কিন্তু সৎ সাজার ভান করলেও ভবি ভুলবার নয়। কাটমানি ফেরত দেওয়ার কথা ঘোষণা করে তিনি যতই তাঁর দলের মেজো সেজো নেতাদের ফাঁসিয়ে দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চান না কেন, কিছু প্রশ্ন তাঁকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকবেই। এখানে আরও একটি বিষয়ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এই প্রথম এই দেশের কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দলের দুর্নীতির কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন। এখন প্রশ্ন হলো, হঠাৎ রাতারাতি এভাবে কাটমানি ফেরত দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন কেন মুখ্যমন্ত্রী, সরকারে থাকার আট বছর পরে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কাটমানি ফেরত দেওয়ার ঘোষণায় কেউ কেউ আহ্লাদিত হলেও হতে পারেন। ভাবতেও পারেন, তৃণমূল কংগ্রেস দলটার বাকি সকলে অসৎ হলেও, একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই সততার পরাকাষ্ঠা। এই ভেবে আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইমেজ বিল্ডিংয়েও নিয়োজিত হতে পারেন তারা। কিন্তু এসব ভাবার আগে তাদের আর একটু ভাবার অনুরোধ করি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আট বছরের শাসনকালের ভিতরই তোলাবাজরা গিয়ে এলগিন রোডে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বাসভবনে হানা দিয়েছে। সমস্ত রাজ্য তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল এই ঘটনায়। শুধুমাত্র মমতা জানেন না— একথা কি মেনে নেওয়া যায়? বাগুইআটি-কেষ্টপুর অঞ্চলে সিন্ডিকেটের এলাকা দখলের লড়াই খুনোখুনির পর্যায়ে পৌঁছেছিল। মমতার দলেরই দুই নেতা একে-অপরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়েছিলেন । মমতা জানেন না? তোলাবাজিতে অতিষ্ঠ হয়ে এই রাজ্য থেকে শিল্পপতিরা পাততাড়ি গুটিয়েছেন— মমতা জানেন না, একথা বিশ্বাস করতে হবে? সারদা কাণ্ডে অভিযুক্ত হয়ে মমতার সাংসদ, বিধায়করা জেল খেটেছেন। এর কী ব্যাখ্যা দেবেন মমতা? কার স্বার্থে তিনি সারদা কাণ্ডে অভিযুক্তদের আড়াল করতে গিয়েছিলেন? আসলে এই কাটমানি ফেরতের কথা বলাটাও তার সততার প্রতীক হোর্ডিং টাঙানোর মতোই স্টান্ট। যে মমতা প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন তার দলে কেউ ঘুষ খায় না, সেই মমতাই যখন কাটমানি ফেরত দেওয়ার কথা বলেন, তখন বুঝতেই হবে ইঁদুর এতদিনে কলে পড়েছে।



'মমতা যে কাটমানি ফেরানোর ডাক দিলেন, সে ডাকে তাঁর দলের রাঘব বোয়ালরা সাড়া দেবেন তো? ফেরত দেবেন তো তাঁরা কাটমানি?'

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি যদি এই রাজ্যে আঠারোটি আসন দখল করতে না পারতো— একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, তাহলে কখনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাটমানি ফেরত দেওয়ার কথা বলতেন না। বরং তাঁর ভাই-বেরাদরদের কাটমানি এবং তোলাবাজির আসর জাঁকিয়ে বসত এই রাজ্যে। এখন বলছেন, কেননা বুঝতে পারছেন, আট বছরের মাথাতেই তাঁর এবং তাঁর দলের গ্রহণযোগ্যতা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম রাজনীতিক, যিনি 'সততার প্রতীক' কাট আউট টাঙিয়ে নিজের সততাকে প্রচার করতে নেমেছিলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নিজের সততাকে এমনভাবে বিপণনযোগ্য করে তোলেন কারা? তারা কি প্রকৃত অর্থেই সৎ, নাকি তাদের সততা একটি ভানমাত্র?



তলানিতে এসে পৌঁছেছে। মমতার এই কাটমানি ফেরত দেওয়ার হুংকারের পিছনেও একটি রাজনৈতিক কৌশল কাজ করেছে। মনে রাখবেন, কাটমানি ফেরত দেওয়ার কথা বলার ঠিক একদিন আগে নবান্নে মমতা দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজিস্ট প্রশান্ত কিশোরের সঙ্গে। নবান্ন সূত্রেরই খবর, এই বৈঠকটাই ছিল ২০১৯-এর এই বিপর্যয়ের পর ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে কীভাবে মমতার ভাবমূর্তি আবার উজ্জ্বল করা যায় তার কৌশল নির্মাণের। নবান্ন সূত্র জানাচ্ছে, ওই বৈঠকে বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের কাটমানি এবং তোলাবাজির বিষয়টি ওঠে। বিষয়টি তোলেন স্বয়ং প্রশান্ত কিশোর। প্রশান্ত কিশোর মমতাকে বলেন, এই তোলাবাজি এবং কাটমানির অভিযোগই তৃণমূলের ক্ষতি করেছে। ওই বৈঠকের পরেই মমতা কিন্তু কাটমানি ফেরত দেওয়ার কথা বলেছেন। আরও লক্ষ্যণীয় প্রশান্ত কিশোরের সঙ্গে ওই বৈঠকের পরেই মমতা কিন্তু তাঁর সেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গি পাল্টে ফেলে অনেকটাই নমনীয় হয়েছেন। বোঝাই যায়, প্রশান্ত কিশোরের পরামর্শে রাজনৈতিক কৌশল হিসাবেই কাটমানি ফেরতের কথা এখন বলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর ভিতর তাঁর আন্তরিকতা খুঁজতে যাওয়ার অর্থ বোকামি। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়। মমতা যে কাটমানি ফেরানোর ডাক দিলেন, সে ডাকে তাঁর দলের রাঘব বোয়ালরা সাড়া দেবেন তো? ফেরত দেবেন তো তাঁরা কাটমানি? দার্জিলিঙের ডেলোর বাংলোয় বৈঠকের পর মমতার দলের যে রাঘব বোয়ালরা সুদীপ্ত সেন আর গৌতম কুণ্ডুর থেকে দু'হাতে টাকা লুটেছিলেন, তারা টাকা ফেরত দেবেন তো? সুদীপ্ত সেন এবং গৌতম কুণ্ডু দুজনেই যদি এখন টাকা ফেরত চান— তাহলে কী হবে? প্রতিমাসে তেরোটি গাড়ির কনভয় নিয়ে মমতার দলের যে সর্বশক্তিমান নেতা পুরুলিয়া-আসানসোলের কয়লা মাফিয়াদের কাছ থেকে টাকা আনতে যান— তিনি কাটমানি ফেরত দেবেন তো? বন্দর অঞ্চলের যে নেতাকে কাটমানি না দিলে বন্দরে কাজ করা যায় না, বা উত্তর চব্বিশ পরগনায় যে বিধায়ক গোরু পাচারের টাকা খান— তারা টাকা ফেরত দেবেন তো? হরিশ মুখার্জি রোডে মমতার দলের যে নেতা প্রাসাদোপম বাড়ি বানিয়েছেন— তার তোলাবাজির টাকা কে ফেরত দেবে? গত আটবছরে জনৈক রঞ্জিত ঘোষের স্ত্রী ও তার পরিবার যেভাবে ২১টি জমি-বাড়ি কিনে এক হাজার কোটি টাকারও বেশি সম্পত্তি বানিয়েছেন— তারা তোলাবাজির টাকা ফেরত দেবেন তো? এই প্রশ্নগুলি এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা নিজের ঘনিষ্ঠ বৃত্তের লোকজনদের আড়াল করতে মমতা যেভাবে মেজো-সেজো নেতাদের ফাঁসিয়ে দিয়েছেন, তারাই নিজ নিজ পিঠ বাঁচাতে এইসব প্রশ্ন অচিরেই করতে থাকবেন। কারা কারা কোথায় কীভাবে তোলার বখরা খেয়েছেন— তা এই নেতাদের থেকে আর ভালো কেউ জানেন না। কয়লা মাফিয়াদের কাছ থেকে তোলার টাকা এই মেজো-সেজো নেতাদের হাত হয়েই বড়ো মাথার কাছে পৌঁছেছে। ইতিমধ্যেই পুরুলিয়ার এক তৃণমূল নেতা দলের অন্দরেই হুমকি দিয়ে রেখেছেন— 'আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা হলে আমি কান-মাথা ধরে টান দেন। তখন গোটা দলটাই জেলে যাবে।'

প্রশান্ত কিশোরের পরামর্শে কাটমানি ফেরত দেওয়ার রাজনৈতিক চালটি চেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ সুবিধা হবে বলে মনে হচ্ছে না। বরং, তিনি কাটমানি ফেরত দেওয়ার কথা বলে দলের অন্দরে এক মুষল পর্বের সূচনা করে দিয়েছেন। অচিরে, এই কাটমানি প্রসঙ্গেই দলীয় নেতারা একে অপরের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করবেন। আর সে আক্রমণের হাত থেকে কাঁচের ঘরে বসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও রেহাই পাবেন না। আসলে পচনটা অনেকদিন আগে মাথাতেই ধরেছে। এখন তা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বাঙ্গে। মনে পড়ছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সেই ভুবন ও তার মাসির গল্প। খুব অল্প বয়সেই চুরি বিদ্যায় হাত পাকিয়েছিল ভুবন। ভুবনের চুরি বিদ্যার কথা জেনেও তার মাসি তাকে কখনো শোধরানোর চেষ্টা করেনি। শেষে ভুবন পুলিশের জালে ধরা পড়ল। আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলো ভুবন। আদালতে দাঁড়িয়েই ভুবন বিচারককে বলেছিল— আমার ইচ্ছে মাসির সঙ্গে একবার কথা বলে যাই। আদালতের অনুমতিতে ভুবনের মাসিকে ভুবনের সামনে আনা হলো। ভুবন মাসিকে বলেছিল— ছোটোবেলা থেকে তুমি যদি আমাকে শাসন করতে আজ তাহলে আমার এই দশা হতো না। বলে মাসির কান কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছিল ভুবন।

শাসন যদি করতেই হয়, তাহলে প্রথমেই শাসন করা উচিত ছিল মমতার। এখন তো ভুবনের কান কামড়ে ছিঁড়ে নেওয়ার পালা। এখন মমতাকে কান বাঁচাতে হবে। ■

কর্মযোগীর কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনা ও মাতৃপূজন

গত ২৩ জুন বিশিষ্ট স্বয়ংসেবী ও রাষ্ট্রবাদী সেবা সংস্থা 'কর্মযোগী'-র উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নিমতা রবীন্দ্রপল্লীর মাতৃভবনে ২০১৯ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক



পরীক্ষায় কৃতী বিদ্যার্থীদের সংবর্ধনা ও মাতৃসংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট চক্ষু শল্যচিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার সরকার। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদক রন্তিদেব সেনগুপ্ত ও সমাজ সেবা ভারতী দক্ষিণবঙ্গের সহ সম্পাদক প্রদ্যুৎমল বসু। এদিন নববারাকপুর, নিমতা, খড়দা, বিরাটি, টিটাগড়, কর্ণমাধবপুর, বিলকান্দা, বেলঘড়িয়া, পানিহাটি প্রভৃতি এলাকার ৩০ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা জানিয়ে তাদের হাতে সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার হেডগেওয়ার,ভারতমাতা ও স্বামীজীর বাঁধানো একটি করে ফোটো , ডাক্তারজীর সংক্ষিপ্ত জীবনীগ্রন্থ ও স্বামীজীর চিকাগো বক্তৃতার একটি সংকলন পুস্তিকা দেওয়া হয়। বিদ্যার্থীদের মায়েদের শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের হাতে একটি বাঁধানো শ্রীশ্রী সারদা মায়ের ছবি ও মিষ্টির প্যাকেট দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক ডাঃ সনৎ কুমার বসুমল্লিক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কর্মযোগীর সভাপতি তথা বারাকপুর জেলার সঙ্ঘের সেবা প্রমুখ নারায়ণ মণ্ডল ও নিউ বারাকপুর নগরের বৌদ্ধির প্রমুখ সুব্রত কুমার দত্ত।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গ

মালদা জেলার গাজোলের কদুবাড়ির মনমোহন শ্রীমতীদেবী সরস্বতী শিশুমন্দিরে গত ৫ থেকে ১৫ জুন উত্তরবঙ্গ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গ অনুষ্ঠিত হয়। বর্গের উদ্বোধন করেন ঘাকশোল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বৈবস্বানন্দজী মহারাজ। উত্তরবঙ্গের ৯২ টি গ্রাম থেকে ৩১ জন জন মহিলা-সহ ১৪২জন কার্যকর্তা বর্গে অংশগ্রহণ করেন। বর্গে সর্বাধিকারী রূপে নিখিল চন্দ্র মজুমদার, ব্যবস্থা প্রমুখ মন্টু সরকার, কার্যালয় প্রমুখ অনন্ত কুমার সরকার, বৌদ্ধিক প্রমুখ প্রদীপ থাপা এবং মুখ্য শিক্ষক রূপে প্রসেনজিৎ সরকার উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যকর্তা যুগল কিশোরজী, সুধাংশু পট্টনায়জী, বালকৃষ্ণ নাইক দেওজী রাউত প্রমুখ বর্গ পরিদর্শন করেন। বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হাতিমারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ফটিক চন্দ্র মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ, উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সম্পাদক উদয়শঙ্কর সরকার, সভাপতি বিদ্রোহী সরকার, সংগঠন সম্পাদক অনুপ মণ্ডল প্রমুখ।





শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান



গত ২২ জুন কলকাতার প্রখ্যাত সামাজিক-সাহিত্যিক সংস্থা শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে 'ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান' প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পুস্তকালয়ের শতাব্দী বর্ষে আয়োজিত ৩০ তম সম্মান প্রদান করা হয় বিশিষ্ট চিন্তক-লেখক তথা উত্তর প্রদেশ বিধান সভার অধ্যক্ষ হৃদয় নারায়ণ দীক্ষিতকে। সম্মান স্বরূপ তাঁর হাতে এক লক্ষ টাকার চেক, মানপত্র ও শাল দিয়ে সম্মানিত করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীরাম নাইক।

সম্মানে ভূষিত হয়ে শ্রী দীক্ষিত কুমারসভা পুস্তকালয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলেন, আমাদের সংগঠনহীনতার কারণে মুষ্টিমেয় বিদেশি আমাদের দেশ দখল করে বছরের পর বছর দেশের সম্পদ লুঠ করেছে। ভারতবাসীও তখন ভেদ বিভেদে দীর্ণ ছিল। ডাঃ হেডগেওয়ার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংবেক সঙ্ঘ স্থাপন করে সেই ভেদাভেদ সমাপ্ত করার বীজ বপন করলেন। তিনিই দেশের প্রথম সংগঠন বিজ্ঞানী যিনি দেশের প্রকৃত রোগ ধরতে পেরেছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশিষ্ট গায়ক ওমপ্রকাশ মিশ্র 'পূর্ণ করেঙ্গে হম সব কেশব, ওহ সাধনা তুমহারি' গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার সচিব প্রদীপ দুবে, ইটাওয়া সেবানিধির প্রদীপ গুপ্ত, গোরক্ষপুরের শৈলেন্দ্রমণি ত্রিপাঠী, শিলিগুড়ির কমল তিওয়াড়ী, প্রয়াগরাজের ড. প্রকাশ ত্রিপাঠী, বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ সুভাষ সিংহ, ডাঃ শিশির সিংহ-সহ কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পুস্তকালয়ের সচিব মহাবীর বাজাজ।

ফুলিয়ায় 'নতুন ভারত'-এর উদ্যোগে হাসপাতাল সাফাই অভিযান

রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের বলিদান উপলক্ষ্যে গত ১৭ জুন নদীয়া জেলার ফুলিয়ার 'নতুন ভারত'-এর উদ্যোগে ফুলিয়া সরকারি হাসপাতালে তিন ঘণ্টার সাফাই অভিযান করা হয়। এর আগে ফুলিয়া শিক্ষা নিকেতন ও এরকম অভিযান পরিচালনা করা হয়। নতুন ভারতের নেতৃত্বে রয়েছেন শুভজিৎ রায়। সাফাই অভিযানে এলাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন।

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana (NR)
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

সিউড়ী সংস্কার ভারতীর 'বোধোদয়' উৎসব



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবর্ষ উপলক্ষ্যে গত ২৩ জুন 'বোধোদয়' উৎসবের আয়োজন করে অখিল ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সংস্কার ভারতী সিউড়ী শাখা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লোক সংগীত শিল্পী স্বপ্না চক্রবর্তী। সিউড়ীর ডিআরডিসি-র দর্শক ঠাসা সভাকক্ষে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অধ্যক্ষ পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি এবং উজ্জ্বল অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে সুরকার গীতিকার মানস চক্রবর্তী, সংগঠনের অখিল ভারতীয় অন্যতম সম্পাদক নিরঞ্জন পণ্ডা, সংগঠনের প্রাদেশিক মাতৃশক্তি প্রমুখ মহাশ্বেতা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে নটরাজ মূর্তির সম্মুখে দীপ প্রজ্বলন করেন বিশিষ্ট অতিথিরা। মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিদের ভুট্টার খোলার তৈরি সুদৃশ্য ফুল দিয়ে বরণ করেন সংস্থার শিল্পীরা। তাঁদের হাতে দেওয়া হয় উত্তরীয়, পাতার মুকুট ও সম্মান স্মারক।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে গান্ধীজীর জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে তাঁর প্রিয় ভজনালেখ্য ' গীত সুধা রসে বাপুজী' পরিবেশিত হয়। ২৫ জন শিশু-কিশোর শিল্পী দক্ষতার সঙ্গে ৩ টি গান পরিবেশন করে। তারমধ্যে 'বৈষ্ণব জন তে তেনে কহিয়ে জে' দর্শকদের মুগ্ধ করে। প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সমরজিৎ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে 'নারী মুক্তির আখ্যান মঞ্জরী' গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হয়। পাঁচ জন গৃহবধূ সুসজ্জিত ভাবে পাঁচটি গীত পরিবেশন করেন। সংগীত গোষ্ঠীর পরিচালনায় ছিলেন মৌসুক্তি সরকার। শেষ পর্বে সিউড়ী শাখার নাট্য প্রয়াস 'আলোর ঠিকানা' এদিনের অনুষ্ঠানে বাঙ্গালার শিশু সাহিত্যে উপেন্দ্র-সুকুমার-সত্যজিতের সাহিত্য কর্ম 'রামগরুড়ের ছানা কিংবা 'গোমরাথেরিয়াম'-এর চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে দর্শকদের কিছুক্ষণের জন্য নিয়ে যায় তাদের শৈশবের দিনগুলিতে। দর্শকাসনে ছোটোরাও হেসে লুটোপুটি খেয়েছে। এই নাট্য প্রয়াস নির্মাণ করেছেন স্বরূপ সরকার। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন মৌমিতা বিষ্ণু।

হালিশহরে সংস্কৃতভারতীর আবাসীয় বর্গ

গত ২ থেকে ৯ জুন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হালিশহর নিগমানন্দ মঠে ৭ দিনের সংস্কৃত আবাসীয় বর্গ অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে বর্গে ১৫১ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। বর্গের উদ্বোধন করেন অসম বঙ্গীয় মঠের মহান্ত পূজ্যপাদ স্বামী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের ড. গৌতম চন্দ্র। বর্গে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা সংস্কৃতেই কথোপকথন এবং পঠনপাঠন করে। শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। একদিন শিক্ষার্থীরা শোভাযাত্রা সহকারে হালিশহরের পথ পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করেন। বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর ড. হরেকৃষ্ণ মিশ্র এবং সংস্কৃতভারতীর অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ ড. পি নন্দকুমার। বর্গের দীক্ষান্ত সমারোহে প্রত্যেক শিক্ষার্থী একটি করে প্রদীপ প্রজ্বলন করে সংস্কৃতময় ভারতবর্ষ গঠনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।





বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে ভরতনাট্যম্ নৃত্যশৈলী

ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়



বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির যে ঐতিহ্য বহমান, সেই বহমানতার এক উল্লেখযোগ্য কাণ্ডারি টি. বালাসরস্বতীর শিষ্যা প্রিয়ম্বদা শঙ্কর। প্রিয়ম্বদা মাদ্রাজ মিউজিক অ্যাকাডেমিতে তাঁর স্বনামধন্যা গুরুর কাছে ভরতনাট্যম্ নৃত্য শিক্ষা লাভ করেন। দক্ষিণ ভারতের এই কালজয়ী নৃত্যকলা ভারতনাট্যমের এক বিশিষ্ট শিল্পী ও নৃত্যগুরু হলেন প্রিয়ম্বদা যিনি বালাসরস্বতী ঘরানাকে বিদেশের মাটিতে বসেও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বাহান্ন বছর যাবৎ পাশ্চাত্যে বসবাসকারী বর্তমানে কানাডার বাসিন্দা প্রিয়ম্বদাকে বহু শিল্পানুরাগী মানুষ একজন জীবন্ত কিংবদন্তী হিসাবেই দেখেন।

প্রিয়ম্বদার গুরু টি. বালাসরস্বতী বিখ্যাত তাঞ্জাভুর ঘরানার অনুসারী ছিলেন। এই নৃত্যশৈলীর একজন নিষ্ঠাবতী শিল্পী হিসেবে তিনি প্রভূত যশ লাভ করেন। তাঁর শিল্পের বৈশিষ্ট্য ছিল 'নৃত্য', পবিত্র নিষ্কলুষ এক পরিবেশনা যা তাঁকে 'অভিনয়কলার সম্রাজ্ঞী' হিসাবে পরিচিতি দেয়। তিনি ভরতনাট্যমের সাহায্যে তাঁর দর্শকদের অভিভূত করে রাখতেন। সঙ্গীতকে নৃত্যের মাধ্যমে তিনি উপস্থাপিত করতেন।

ভারতে এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে বালাসরস্বতীর জন্মশতবার্ষিকী ২০১৮ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

১৮ বছর ধরে প্রতিদিন কঠোর অনুশীলনের পরে বালাসরস্বতী প্রিয়ম্বদাকে তাঁর নৃত্যশৈলীর উত্তরাধিকার দান করেন। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রিয়ম্বদা পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় নৃত্যকলার প্রচার ও প্রসার ঘটিয়ে চলেছেন নিষ্ঠা সহকারে।

১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশক ভরতনাট্যম্ নৃত্যকলার স্বর্ণযুগ বলা যায়। ওই সময় প্রিয়ম্বদা এক অতি উজ্জ্বল তারকা হিসাবে শিল্পজগতে প্রতিভাত হন। ওই সময় তিনি মাদ্রাজে এবং ভারতের বিভিন্ন নামকরা প্রতিষ্ঠানে নৃত্যপ্রদর্শন করেন। ১৯৬২ সালে তিনি ভারত থেকে প্রথম কালচারাল ডেলিগেশন নিয়ে নেপালে যান। মাত্র বারো বছর বয়সে তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

প্রিয়ম্বদার সমগ্র জীবন ভরতনাট্যম্ নৃত্য এবং কর্ণাটক সংগীতের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তিনি কানাডা থেকে মাল্টিকাল্‌চারালিজম্-এর জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন এবং তাঁর শহর থেকে 'অর্ডার অব মেরিট' পুরস্কার পেয়েছেন। সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে পাওয়া সম্মান ও ভালোবাসা। তারা প্রিয়ম্বদার কাছ থেকে শিল্প ও জীবনবোধ— এই দুইয়েরই শিক্ষা লাভ করে থাকে, যার সঙ্গে ভারতীয়ত্ব বা হিন্দুত্ব অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত।

প্রিয়ম্বদা সংস্কৃত ভাষাতেও বিশেষ পারদর্শী। তাঁর পিতা, প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ ও ইন্দোলজিস্ট ড. ভি. রাঘবন ছিলেন তাঁর গুরু। পিতার শিক্ষকতায় তিনি 'নাট্যশাস্ত্রে' বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিয়ম্বদা বক্তৃতা দিয়ে থাকেন, তাঁর বক্তব্যে হিন্দু সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য, কালজয়ী শিল্পকলা প্রাধান্য পায়, কানাডার শিল্পমহলে তিনি তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন, এ কথা অনায়াসেই বলা যায়।

কানাডায় একটি Inter-Faith Council আছে। যাদের কাজ হলো বিভিন্ন জনসম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি স্থাপন করা। সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে একটি মানবিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা, ভ্রাতৃত্ববোধ জাগানো, বিশ্বজনীনতার আদর্শকে তুলে ধরা। প্রিয়ম্বদা এই কাউন্সিলের একজন সম্মানীত সদস্য হিসেবে নিরলস কাজ করে চলেছেন।

বর্তমানে প্রিয়ম্বদা তাঁর স্বামী, সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাতনি-সহ আধুনিক কানাডার জনজীবনের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছেন। হিন্দু-সংস্কৃতি ও ভারতীয় শিল্পকলা সংরক্ষণ ও প্রচারের কাজে ব্যাপৃত আছেন।

গত পাঁচ দশক যাবৎ প্রিয়ম্বদা বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠান করে চলেছেন সমাজ সেবার উদ্দেশ্যেও। এই কারণেই তিনি একটি শিক্ষামূলক তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন যার নাম 'A Dance Gods yarn to witness'— 'দেবতাগণও যে নৃত্য দেখতে আগ্রহ বোধ করেন।' বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জগত থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই ভাবেই তিনি ভরতনাট্যম্ ও ভারতীয় ঐতিহ্যের ব্যাপ্তি ঘটিয়ে চলেছেন।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রিয়ম্বদা এক অতুলনীয় উদাহরণ স্বরূপ, যিনি উত্তর আমেরিকায় বালাসরস্বতীর ঐতিহ্যকে ব্যাপকতা দিয়ে চলেছেন। তাঁর ভারতীয় শিল্পকলা প্রসারের আন্তরিক প্রচেষ্টা তাঁকে মানব সমাজে এক অবিস্মরণীয় স্থান দিয়েছে, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। ▮



পরিবেশ রক্ষায় হিন্দু দর্শন

শুভেন্দু সরকার

আধুনিক পৃথিবীতে জনবিস্ফোরণের সঙ্গে মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ভোগপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির অশুভ প্রতিযোগিতা বিশ্বজুড়ে চলছে। অবাধে ধ্বংস করা হচ্ছে অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ। ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। পরিবেশ দূষণের মাত্রা বিপজ্জনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃতির নিজস্ব জীবনদায়ী ভারসাম্যের রক্ষাকবচ বিনষ্টকারী এই পরিবেশ দূষণ আজ নিশ্চিতভাবে মানব সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান পৃথিবীর পরিস্থিতি বিচার করে আধুনিক বিজ্ঞানীরা বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনে জোর দিয়েছে। কিন্তু কতটা সাফল্য পেয়েছে তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় কোথাও একটা বড়ো ত্রুটি রয়েছে। যে কোনো সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্ম হয় কোনো বিশেষ দর্শন বা চিন্তনের মাধ্যমে। আজকের পৃথিবীতে চিন্তাভাবনা, জীবনযাত্রা সবকিছুই গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্যে প্রভাবে, পাশ্চাত্য ভাবধারায়। ভোগবাদী এই জীবন দর্শন সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ও সমন্বয়কে পাশ্চাত্য দর্শন স্বীকার করে না।

পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাবে সভ্যতার নামে আমরা আজ মৃত্যুর মহামিছিলে যোগ দিয়েছি। প্রকৃতিমাতা দ্রুত ভারসাম্য হারাচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদের নবীকরণ হচ্ছে না, দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবুও আমাদের চেতনা নেই। এই প্রাকৃতিক সুরক্ষার চেতনা আমরা পাই হিন্দু দর্শন, সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, হিন্দু সংস্কৃতি ও পরম্পরায়। ভারতীয় সভ্যতা, দর্শন, চিন্তা গড়ে উঠেছে হাজার হাজার বছর আগে। যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা বিনাশের কারণ হয়, তাহলে ভারতীয় তথা হিন্দু সভ্যতা সৃষ্টির কারণ।

ভারতীয় দর্শন বিশ্ব প্রকৃতিকে নির্জীব পদার্থ বলে মনে করে না। বিশ্ব প্রকৃতি সজীব, সম্পূর্ণ ও প্রাণময়। মানব জীবনের সঙ্গে আত্মিক ও জৈবিক বন্ধনে যুক্ত এক মহান সত্তা। মানুষ, প্রাণীজগত, আকাশ, বাতাস, সবকিছুই ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ। কেউই পৃথক নয়। এই সত্যকে সহস্রাধিক বছর পূর্বে ভারতীয় ঋষি দার্শনিকরা উপলব্ধি করেছিলেন। তারা বলেছেন এই বিশ্ব প্রকৃতির যা কিছু দেখছি তা মহামায়ার মায়া। তাই মায়ামুক্ত হয়ে সত্যকে জানার নির্দেশ দিয়েছেন, ভোগাকাঙ্ক্ষা ও ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগের মাধ্যমে। তবেই দূষণমুক্ত পরিবেশে সুস্থ জীবনযাপন সম্ভব।

ভারতীয় জীবন দর্শনে গৈরিক রং ত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রতীক। আধুনিক বিশ্বে দূষণমুক্ত পরিবেশকে গ্রিন বা সবুজ রং বলা হয়। গৈরিক চিন্তনই পারে আধুনিক বিশ্বে দূষণহীন সমাজ ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে। ভোগ নয়, ত্যাগের মাধ্যমেই প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা সম্ভব। ভোগবাদ প্রকৃতিকে শোষণ করে, ত্যাগব্রত প্রকৃতিকে রক্ষা করতে শেখায়। ভোগ থেকে অধিকার বোধের জন্ম হয়, মানুষকে হিংসায় প্ররোচিত করে। ত্যাগ শান্তি দেয়। মানুষ-প্রকৃতি-পরিবেশের মধ্যে সুস্থ শৃঙ্খল গড়ে তোলে।

হিন্দু দর্শন শুধু হিন্দুর জন্য নয়। হিন্দু জীবনবোধ সমগ্র মানবজাতির জন্য। হিন্দু জীবনযাত্রার শিক্ষা গ্রহণ করলে প্রকৃতি তখন ভোগ্য নয়, স্নেহময়ী মাতারূপে মানব সমাজের কাছে প্রতিভাত হবে।

উপনিষদের প্রথম ছন্দোবদ্ধ বাণীতে পাই— 'এই বিশ্বের সমস্ত কিছুতেই ঈশ্বরের রূপ প্রতিভাত। সবই ঈশ্বরের দান। প্রতিটি বস্তুতেই সকলের সমান অধিকার। তাই সকলে একত্রে তা ভাগ করে নাও। অন্যের প্রাপ্য জোর করে অধিকার করো না।' আবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছেন— 'প্রাণী অন্ন হতে, অন্ন মেঘ হতে, মেঘ যজ্ঞ হতে উৎপন্ন হয়, একেই জীবনচক্র বা সৃষ্টিচক্র বলে। যে ব্যক্তি প্রকৃতির এই সৃষ্টিচক্রে বাধা দেয় সে ইন্দ্রিয় আসক্ত মহাপাপী।' গীতার বাণী অনুসারে সর্বজনের হিত চিন্তায় প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ বা লুণ্ঠনের প্রশ্ন আসে না।

আবার হিন্দু সমাজে সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় পরম্পরায় বৃক্ষ, পর্বত, নদনদী, পশুপাখির পূজা ও শ্রদ্ধার মাধ্যমে প্রকৃতির সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্যভাবে বলা যায়, 'অরণ্যষষ্ঠী'। এটি অরণ্য সৃজনের ব্রত। এটি সাধারণত জ্যৈষ্ঠের শেষে সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়। খনার বচনে বলেছেন— 'জ্যৈষ্ঠের সাত, আষাঢ়ের সাত, তবে জানবি মিগের বাত' অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠের শেষের সপ্তাহে এবং আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ-এক পক্ষকাল সূর্য মিগ অর্থাৎ মৃগশিরা নক্ষত্রে থাকে, তখন 'বাত' অর্থাৎ মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ আরম্ভ হয়, বর্ষাকালের সূচনা হয়। ঠিক এই সময়ই এক ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে অরণ্য সৃজনের উপায় নির্দেশ করে গেছেন প্রাচীন মুনি-ঋষিরা। সুস্থ প্রকৃতি ও মানবজীবনের জন্য অরণ্য যে একান্ত প্রয়োজন তা হিন্দুধর্মের প্রাচীন শাস্ত্রকাররা জানতেন। তাই অরণ্য সৃজনের কথা বলেছেন।

তাই আজকের ভোগবাদ পৃথিবীতে একদিনের পরিবেশ দিবস পালনই যথেষ্ট নয়। দীর্ঘ সমাধানের জন্য প্রয়োজন হিন্দু দর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগ। তবেই দূষণমুক্ত সবুজ নির্মল পরিবেশ বিশ্বে গড়ে তোলা সম্ভব। ■

হিন্দু মহাকাব্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবটের উল্লেখ

সৌমেন নিয়োগী

ভারতীয় হিন্দুদের মনের মণিকোঠায় মহাকাব্যের স্মৃতির প্রবহমান ধারা আজও বিস্মৃতির অচলায়তনে নিক্ষিপ্ত হয়নি। মহাকাব্যের মধ্যে পুষ্পকরথ থেকে আরম্ভ করে ক্ষেপণাস্ত্রের মতো বিভিন্ন প্রযুক্তির উল্লেখ রয়েছে, যাকে কেন্দ্র করে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক মহলে নানা প্রকার আলোচনা, তর্ক ইত্যাদিতে দেশের প্রায় অনেক স্থানেই বিতর্কের বাতাবরণ সৃষ্টি করে। এর ফলে স্বভাবতই একদল বুদ্ধিজীবী প্রায়শই এই ধরনের চিন্তন ও আলোচনায় তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে থাকেন। তাঁদের মতে আমাদের মহাকাব্য পুরাণ কাল্পনিক ও অসার। কিন্তু এঁরা ভেবেও দেখেন না 'what is fiction today tommorow it is a fact'।

যেমন ধরুন জুলেভার্নের রচনাগুলি Twenty thousand leages under the sea, Around the World in Eighty days, Journey to Moon ইত্যাদি যা সব সে যুগের অলৌকিক ঘটনা আজ কিন্তু তা বিজ্ঞান সিদ্ধ বাস্তব। কথায় বলে 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না' ঠিক তাই। যেহেতু বিদেশিরা তার রচয়িতা তাই সবই সঠিক, আর ভারতের ক্ষেত্রে সবই হিন্দুত্ববাদী ও অলীক।

তবে এই ভারতীয় মহাকাব্যের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে Standford University-র গবেষক Adriene Mayor তাঁর সম্প্রতিকালের গ্রন্থে 'Gods and Rabots ` Myths, Machines and Ancient Dream of Technology'তে তিনি অত্যন্ত যত্নশীল ভাবে তুলে ধরেছেন প্রাচীন সেই সংস্কৃতির ভবিষ্যতের প্রযুক্তির কল্পনাশক্তি যার ছাপ রয়ে গেছে তাদের মহাকাব্য ও পুরাণের মধ্যে। তাঁকে এই বিষয়ের গ্রন্থ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন তাঁর গবেষণার তাগিদের প্রথম ইঙ্গিত পান সমগ্র পৃথিবীর মাইথোলজি গুলিতে সেখানে প্রাচীন মানুষ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা যান্ত্রিক বস্তু, রোবট ইত্যাদির চিন্তনের ক্ষেত্রে এক বিশেষ দূরদৃষ্টির



ছাপ রেখে গেছেন, আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবনের অনেক অনেক পূর্বে যা সত্যই বিস্ময়কর।

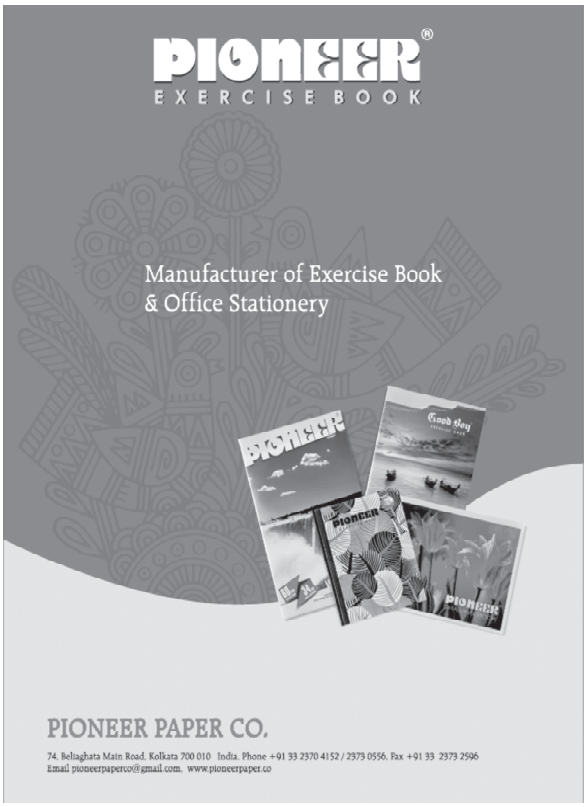
তিনি রামায়ণ, মহাভারত ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন পুরাণ থেকে দেখিয়েছেন গ্রিক মাইথোলজির প্রযুক্তির দেবতা ও ঐন্দ্রজালিক হেপ্তাইস্তাস্ ও ডেইডালমের সঙ্গে ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ বিশ্বকর্মা ও ময়ের যান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন উপাখ্যান। সেক্ষেত্রে এই সমস্ত রচনা সম্ভারই পৃথিবীর প্রথম কল্পবিজ্ঞানের গল্প। অবশ্য তিনি এক্ষেত্রে এই চিন্তনের কৃতিত্ব কোনো বিশেষ সভ্যতার একচেটিয়া বলে শিকার করেননি, বরং সমগ্র বিশ্বে প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে অনুরূপ কর্মকাণ্ডগুলি দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য সেই প্রাচীন পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির সঙ্গে আধুনিক শিল্প প্রযুক্তি উদ্ভবের এক সরলীকরণ করতে তিনি চাননি। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে ভারতীয় ও হেলিনিস্টিক সংস্কৃতি একে অপরকে দেওয়া-নেওয়া ও প্রভাবিত করেছে যা আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে শুরু করে চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বে ম্যাসাডোনীয় সম্রাট আলেকজান্ডার ও ভারতীয় রাজা পুরুর মধ্যে সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে। তিনি দেখেন কীভাবে প্রাচীন জৈন পুঁথিতে অজাতশত্রুর ইঞ্জিনিয়ারা মর্মাচ্ছাদিত ও ঘূর্ণায়মান ব্লেড নির্মিত 'যুদ্ধরথ' নির্মাণ করেছিলেন যা পরবর্তীকালে পারসিকদের এরূপ ঘূর্ণায়মান ব্লেড নির্মিত রথ নির্মাণ করতে অনুপ্রাণিত করে। শুধু এই নয় অজাতশত্রুর ইঞ্জিনিয়াররা অতিকায় এবং উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন যন্ত্রও নির্মাণ করেছিলেন। ভারতীয়রা সংক্রিয় প্রদীপলণ্ঠন ও ন্যাপ্থার ব্যবহার খুব ভালোই জানত যা গ্রিক ও রোমানরা অনেক পরে শিখেছিলেন। প্রখ্যাত গ্রিক পরিব্রাজক ও সন্ন্যাসী 'Apollod orusof Tyana' ভারত ভ্রমণকালের বর্ণনায় লিখে গেছেন কীভাবে ভারতীয় রাজসভায় রোবট ও স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক কর্মচারী ও রথের ব্যবহার এবং বিশেষভাবে 'Distilation এবং 'Hydraulics'- এর মতো প্রযুক্তিব্যবস্থা ভারতীয়রা ইউরোপের থেকে অনেক এগিয়েছিল। তিনি বিভিন্ন পুরাণ উপাখ্যানগুলিতে পুষ্পকবিমান অতিকায় মেশিন, রোবট ইত্যাদির প্রয়োগ দেখিয়েছেন বিভিন্ন উদ্ধৃতির মাধ্যমে। ভগবান বুদ্ধের দেহাবশেষ রক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত Android Warrior-এর উল্লেখ করেছেন ব্রহ্মদেশের কথা থেকে, যেখানে সম্রাট অজাতশত্রু কীভাবে ভবনবাহন যন্ত্রের সাহায্যে বুদ্ধের দেহাবশেষকে স্তূপের মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে সরিয়ে রেখেছিলেন। এইগুলি ছিল এক প্রকার রোবট যোদ্ধা তারা ঘূর্ণায়মান তলোয়ার দিয়ে তা রক্ষা করতে সক্ষম ছিল। ফলত পরবর্তীকালে সম্রাট অশোককে কি ভীষণ বেগ পেতে হয়েছিল এই প্রকার রোবট যোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বুদ্ধের দেবাবশেষ সংগ্রহ করতো। এই প্রযুক্তির গল্পে আমরা দেখতে পাই কীভাবে পাটুলিপুত্রের ইঞ্জিনিয়ার রোমকদেশে গিয়ে গ্রিক প্রযুক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে পুনরায় অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে পাটুলিপুত্রে নিয়ে আসেন। এটা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য যে সম্রাট অশোক বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ সংগ্রহ করেছিলেন ও বিভিন্ন প্রান্তে পাঠিয়েছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী নাগাদ ভারত, গ্রিক, চীন ও আরব দেশের বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারগণ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র নির্মাণ করেন, উড়ন্ত পক্ষীর মডেল, রোবট ইত্যাদি, তার মধ্যে কয়েকটি ছিল ক্ষুদ্র এবং কয়েকটি ছিল অতিকায় বিশাল। এই সকল প্রযুক্তিগুলি চালিত হয়েছিল বিভিন্ন শ্রেণীর লিভার, পুলি, জল, বায়ু ও তাপের পরিচালন পদ্ধতির মাধ্যমে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

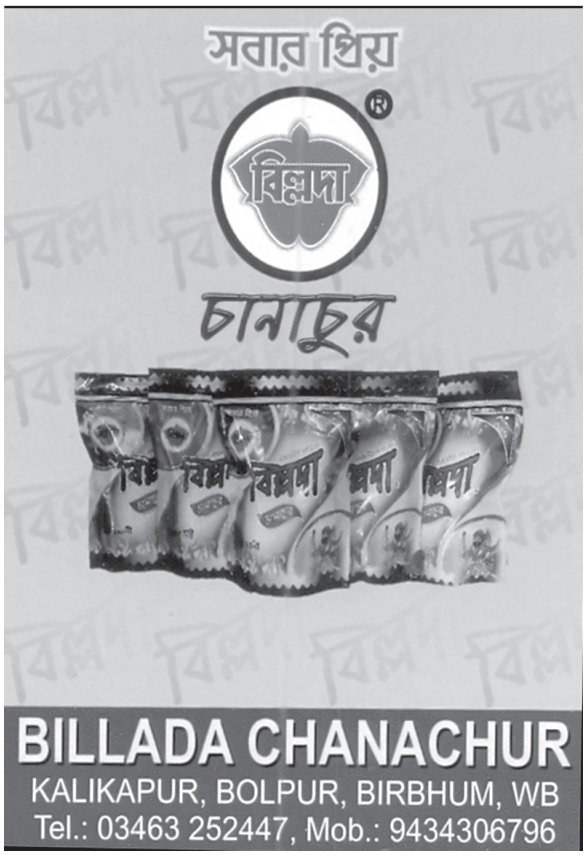
১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩



বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫



ধর্মরক্ষার্থে আত্মঘাতী হন জমিদার চিত্তরঞ্জন

শুভদীপ গাঙ্গুলী

অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুর ইছাপুরা গ্রামে বাস ছিল আমার পূর্বপুরুষদের। এক বর্ধিষ্ণু, স্বচ্ছল পরিবার। পাকাবাড়ি, চাষের জমি, ঠাকুরদালান, পুকুর সমেত স্বচ্ছন্দে দিনযাপন করত। প্রতিবছর শরৎকালে নিয়ম করে অনুষ্ঠিত হতো দুর্গপুজো (যা বর্তমানে কলকাতার বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়)। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে কপর্দক শূন্য হয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল কেবলমাত্র প্রাণটুকু সম্বল করে। একই অবস্থা হয়েছিল আমার অধিকাংশ বর্তমান প্রতিবেশীদের। পাবনা থেকে সমতুল পরিস্থিতিতে আমার মামার বাড়ির পরিবারকেও দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। প্রশ্ন জাগে কেন, কী এমন ঘটেছিল তৎকালীন বাংলাদেশে, যার পরিণতিতে ভিটেমাটি ছেড়ে এই অসহায় মানুষগুলোকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল? আর কোন অবলম্বনের ভিত্তিতেই বা তাঁরা পশ্চিমবঙ্গকে তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল ভেবে আশ্রয় নিয়েছিলেন? এই প্রতিবেদনে এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার একটু চেষ্টা করব।

পূর্ববঙ্গে পূর্বপুরুষদের বসতবাড়ি, খেত, পুকুর, গৃহপালিত পশুপ্রাণী সব ছেড়ে বাধ্য হয়ে দেশত্যাগ করে 'উদ্বাস্তু বাঙ্গাল' তকমা গায়ে নিয়ে নিঃস্ব হয়ে গঞ্জনার স্বীকার হতে হয় বারবার। স্বচ্ছল বাড়িঘর ছেড়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল হয় রিফিউজি ক্যাম্পে অথবা হোগলাপাতার ছাউনিতে। সুবিশাল জমির মালিকানা ছেড়ে জোটে সর্বসাকুল্যে আড়াই কাঠা কলোনির জমি। বিনা কারণে বা শখে কি তাদের এহেন দেশত্যাগ? আজ অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেও তারা উত্তর দিতে পারে না বাংলাদেশের কোথায় তাদের বাড়ি ছিল। একি আমাদের জাতীয় লজ্জা নয়? দেখা যাক কী এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। ঘটনার আঁচ ধিকি ধিকি করে জ্বললেও দাবানলের আকার নিল নোয়াখালিতে হিন্দু নিধনের মধ্য দিয়ে। 'হিন্দু নিধন' শব্দটি ব্যবহার করলাম 'দাঙ্গা'র বদলে। কারণ একতরফা হিন্দুরাই সেখানে লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হয়েছিল প্রায় ৮০ শতাংশ মুসলমানদের দ্বারা। অবাধে লুঠপাট, প্রাণহানি, নারী ধর্ষণ, ধর্মান্তরকরণ-সহ মানবতা বিরোধী সবপ্রকার ঘটনা সংঘঠিত হয়েছিলো নির্বিচারে। এই



উন্মাদনা ও ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র পূর্ববঙ্গ জুড়ে, যার পরিণতিতেই দেশত্যাগ অভাগা হিন্দুদের। অবশেষে বঙ্গ বিভক্তকরণের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম।

হিন্দু হত্যার নায়ক ছিল কুখ্যাত গোলাম সায়োয়ার নামক এক যুবক। সে মুসলিম লিগের নির্বাচনী টিকিট না পেয়ে দুরভিসন্ধি করেছিল হিন্দুদের গণহত্যা ও অত্যাচারের মাধ্যমে নিজেকে মুসলমান নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। তৎকালীন নোয়াখালি বলতে বোঝাতো

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু বাঙ্গালিরা যতদিন থাকবে শ্যামাপ্রসাদ অক্ষয় ও অমর হবেন। হিন্দু বাঙ্গালি বিশেষত উদ্বাস্তু হিন্দু বাঙ্গালিরা কোনোওদিনই শ্যামাপ্রসাদের স্বর্গীয় ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না।

মেঘনা নদীর মোহনা লাগোয়া এক প্রত্যন্ত অঞ্চল, যা নোয়াখালি, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলাগুলিকে নিয়ে একত্রে গঠিত। সালটা ১৯৪৬, লক্ষ্মীপূজার দিন অর্থাৎ (১০ই অক্টোবর)। শুরু হল অত্যাচার যা চলেছিল পরবর্তী একপক্ষকাল জুড়ে। উগ্র সাম্প্রদায়িক ও জেহাদি আগ্রাসনে প্রাণ গিয়েছিল শতশত হিন্দু নর-নারীর। এ তো কেবলমাত্র নোয়াখালিতে। এছাড়াও সমগ্র পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে এর রেশ ছড়িয়ে পড়েছিল। শয়ে শয়ে হিন্দু নিধন শুরু হলো। ধর্মান্তরকরণ, হিন্দু সম্পত্তি দখল, নিরীহ হিন্দু মহিলাদের ধর্ষণের মতো পাশবিক ঘটনাগুলি ঘটতে থাকল সমগ্র পূর্ববঙ্গ জুড়ে। আতঙ্কিত, ত্রস্ত হিন্দুরা দলে দলে দেশত্যাগ করে পদ্মার পশ্চিমপাড়ে আশ্রয় নিতে থাকল। ইতিপূর্বেও ১৯৪১ সালে ঢাকা শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকাতে সংগঠিত ভাবে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করা হয়েছিল। সে দিনও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ছাড়া অন্য কোনো নেতা তাদের পাশে দাঁড়াননি। বিক্ষিপ্তভাবে তখন থেকেই সমগ্র পূর্ববঙ্গে হিন্দুশূন্য করবার ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার শুরু হয়েছিল, তা প্রথমে প্রয়োগ হলো নোয়াখালিতে। উকিল রাজেন্দ্রনাথ চৌধুরীর গোটা পরিবারের ২৬ জন সদস্যকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। নারায়ণপুরের জমিদার সুরেন্দ্রনাথ বসু ও তাঁর কর্মচারীদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। খিলপাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক নলিনী মিত্রের পরিবারকে জোর করে ধর্মান্তরকরণ; ধর্মান্তরিত হতে অস্বীকার করায় মজুপুর গ্রামের এক নিরপরাধ দম্পতিকে কেরোসিন তেল ঢেলে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এহেন অসংখ্য ঘটনা যা সীমিত পরিসরে বলে শেষ করা যাবে না। হামলার তৃতীয় দিনে মহাবলী রায়পুর থানার সায়েস্তানগরের জমিদার চিত্তরঞ্জন দত্ত রায়চৌধুরীর বাড়ি আক্রান্ত হলে তিনি বীরবিক্রমে দস্যুদের সঙ্গে লড়াই করেন। অবশেষে নিজ ধর্ম রক্ষার্থে সপরিবারে আত্মহননের পথ বেছে নেন। গোপাইরবাগের দাস বাড়ি, নোয়াখালির চৌধুরী বাড়ি,

বেগমগঞ্জের পাল বাড়ি-সহ বহু হিন্দু বাড়ির সকল সদস্য সদস্যাদের হত্যা করে জনশূন্য করে দিয়েছিল এই নরখাদকের দল। এমনকী সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প এমনভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিল যে বেগমগঞ্জ থানার বটগ্রামের এক বৃদ্ধ পাঠশালার মাস্টার মশাই শ্রীযুক্ত অক্ষয় চক্রবর্তীকেও তারা ছাড় দিল না। জোর করে ধর্মান্তরকরণের পরও চক্রবর্তী মশাই দুর্গানাম লেখা না ছাড়তে পারায় প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। এমনকী গোলাম সায়োয়ারের যে মাস্টার মশাই, অশীতিপর বৃদ্ধ হরিশ পণ্ডিতকেও সায়োয়ার বাহিনির হাতে প্রাণ দিতে হয়। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে এটা কিন্তু 'মাকু-সেকু'দের দাবি করা তথাকথিত 'শ্রেণিসংগ্রাম'-এর ঘটনা ছিল না। কারণ সমাজের সকল শ্রেণীর হিন্দুরাই অত্যাচারের স্বীকার হয়েছিল। উচ্চবিত্ত জমিদার থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এমনকী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, শূদ্র সকল শ্রেণীই এই ক্ষেত্রে অত্যাচারিত। গরিব চাষি, জেলে, ধোপা, নাপিত, কুমোর, কামার, উকিল-মোক্তার, ডাক্তার সবাই ছিন্নমূল হয়েছিলেন। সুতরাং অর্থনৈতিক বৈষম্য এর কারণ নয়। ঘটনার মূল হলো সাম্প্রদায়িকতার জেহাদি আগ্রাসন। নিরীহ মানুষগুলির অপরাধ ছিল তাঁরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

গান্ধীজী নিজে পদযাত্রা করে হিন্দুদের ঘরে ফেরাতে সচেষ্ট হলেও তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়নি। কারণ পুনরায় আক্রমণে ওই হতভাগ্য পরিবারগুলিকে একবছরের মধ্যেই কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য করা হয়।

ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ছিলেন সেদিন হিন্দুদের পরিত্রাতা। দাঙ্গা বিধ্বস্ত পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা দেশত্যাগ করে প্রাণ বাঁচাতে পশ্চিমভাগের দিকে অগ্রসর হলেও সকলে নিস্তার পেলেন না। রক্তপিপাসুদের দল রাস্তায় ও ট্রেনে উঠেও তাদের পাশবিক হত্যালীলা সংঘটিত করেছিল। ট্রেনভর্তি মৃতদহ সারি শিয়ালদহের স্টেশনে পৌছাত। সে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি। হিন্দুদের এই চরম দুর্দিনে শ্যামাপ্রসাদ নোয়াখালি-সহ পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের পাশেই শুধু দাঁড়ালেন না, বলিষ্ঠ ও দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন এই জোর করে ধর্মান্তকরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। যাদের জোর করে ধর্মান্তারিত করা হয়েছে, তাদেরকে স্বধর্মে ফিরিয়ে আনতে হবে। এমনকী যাদের জোর করে গোমাংস ভক্ষণ করানো হয়েছে বা যেসকল নারী ধর্ষিতা হয়েছেন তাদের প্রত্যেককে কোনো ধর্মীয় গোড়ামি বা কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করানো যাবে না। তাঁরা হিন্দু ছিলেন, হিন্দু আছেন, হিন্দুই থাকবেন। যা ঘটেছে তা তাদের সম্পূর্ণ অনিচ্ছাবশত। যেসকল কুমারীকে জেহাদিরা তুলে নিয়ে গিয়েছিল, দ্রুত তাদের উদ্ধার করে বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিস্থিতি বিচার করতে হবে মানবিকতা দিয়ে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামির কোনো স্থান নেই। কারণ কোনোরূপ সংকীর্ণতা এক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের ধ্বংসের কারণ হতে পারে। তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বহু নর-নারী সসম্মানে যাদের জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিলো, হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিল। একদিকে কলকাতা 'গ্রেটা ক্যালকাটা কিলিং'-এ ক্ষতবিক্ষত, অপরদিকে নোয়াখালি-সহ সমগ্র পূর্ববঙ্গ জুড়ে ছড়িয়ে পড়া হিন্দু নিধন—দলে দলে হিন্দুদের বাধ্য করেছিল নিজেদের বহু পুরুষের ভিটে-মাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতা সহ পদ্মার পশ্চিমপাড়ে চলে আসতে। ঢাকার গ্রামীণ অঞ্চলের ভয়াবহ জেহাদি আগ্রাসন সেদিন আমার হতভাগ্য পরিবারকেও বাধ্য করেছিল দেশত্যাগ করতে।

হুসেন সোহরাওয়ার্দির নেতৃত্বে সংঘটিত 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' রক্তস্নাত করেছিল কলকাতার রাস্তাঘাট। তখনও সেই বিভীষিকা বহন করছে কলকাতা। কিন্তু কংগ্রেসি নেতা যেমন শরৎ চন্দ্র বসু, কিরণ শংকর রায় প্রমুখও সোহরাওয়ার্দির কুচক্রী জালে জড়িয়ে পড়লেন। তাঁরাও স্বপ্ন দেখতে থাকলেন এক সার্বভৌম অখণ্ড বাংলাদেশ গঠনের। এই চক্রান্তে মদত দিয়েছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না, গভর্নর বারোজের, বড়লাট মাউন্টব্যাটেন, লিয়াকত আলি প্রমুখ। সেদিন যে ব্যবস্থাপক সভা গঠনের পক্ষে শরৎচন্দ্র বসুরা মত দিয়েছিলেন তাতে আদপেও কোনো ধর্মীয় ভারসাম্য রক্ষিত হয়নি। ১৪ জন হিন্দু ও ১৬ জন মুসলমানকে নিয়ে সভা গঠনের মাধ্যমে চক্রান্ত করা হয়েছিল ধর্মীয় মেরুকরণের। ড. মুখার্জী প্রমাদ গুনলেন। বুঝতে পারলেন কী সর্বনাশ ঘটতে চলেছে। ইতিপূর্বেই ভারত যাতে ভাগ না হয় তার জন্য তিনি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিলেন। এমনকী মুসলমান নেতৃত্বের কাছে তাঁর প্রস্তাব ছিলো মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে নিয়ে প্রাদেশিক সীমানার পুনর্বিন্যাস করেও অখণ্ড ভারতের কাঠামোর মধ্যে থেকেই তাঁরা পাকিস্তানের সাধ পূরণ করতে পারেন। তিনি লিখলেন—'We can legitimately ask that if the communal problem is really capable of an amicable adjustment under Pakisthan Scheme, Why should not that adjustment be made in existing or re-distributed provincial spheres without the vivisection of India. If the claim is put forward that certain zones predominantly Moslem should remain under the control of their own government so as to advance Moslem interests, it is possible to achieve this, if desired, by a proper redistribution of the provincial boundaries which will not be harmful to the solidarity and stability of a particular zone''.

এমনকী মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলে হিন্দুদের নিরাপত্তা নিয়েও তিনি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বললেন ঃ ''But even in such as event, there will still be a small percentage of non-Moslem inhabitants enjoying equal citizenship and one may well ask what exectly will be the method of safeguarding their rights and privileges''। দেশে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দুই প্রকার বিপদের আশঙ্কা করে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করলেন ঃ

''I have analyzed in some details that two dangers that stand in the way of our future national progress. One is British determination to keep us in bondage as long as it possibly can. The other is the growth of an undefined Pakistan outlook which, if not counteracted, is bound to inflame more and more the minds of masses and their leaders with a dream of Moslem Raj in India.''

ভারতের মাটিতে বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রতিষ্ঠার চিন্তা ত্যাগ করে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মেলবন্ধন ও পারস্পর্যের ভিত্তিতে সুখী ও স্বাধীন ভারত গঠনের উপদেশ দিলেন—''It is only when Hindus and Moslems will stand together, strong, fearless and well trained, both un-

derstanding each other's point of view and realising that it is not Hindustan and Pakistan they now live-in but Englishstan in the truest sense of the word, they will then unite for the attainment of their country's freedom''. যে পথে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া সম্ভব তাও তিনি নির্দেশ করেছেন—''Let each of them follow his own religion, pursue his own culture, contribute to the growth of a common civilisation, imbibing the best elements of both. Let them regard themselves not as belonging to two separate nations that cannot amicably live together, but as two arms of the greatmother which by virtue of their strength and unity will protect her truest interest now and for generations yet unborn''.

এই প্রসঙ্গগুলো উত্থাপন করলাম প্রামাণ্য দলিল হিসাবে। কারণ ইতিহাস না জেনে আজও শ্যামাপ্রসাদের মহত্ত্বকে খর্ব করবার জন্য কেউ কেউ দেশভাগের জন্য তাঁকে দায়ী করেন। এত কিছুর পরও শ্যামাপ্রসাদ দেশভাগ আটকাতে পারলেন না। কারণ সীমিত রাজনৈতিক শক্তির জন্য তাঁর পক্ষে একাধারে মুসলিম লিগের পাকিস্তান দাবি, অপর দিকে ক্ষমতা লিপ্সায় জর্জরিত কংগ্রেস নেতৃবর্গের তাৎক্ষণিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করা সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু তিনি ও তাঁর বিশিষ্ট সহযোগী প্রখ্যাত আইনজ্ঞ নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ উদ্যোগে 'ক্রিপ্‌ট্‌স্ কমিশন' গঠনের মাধ্যমে বার্তা দিলেন বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সকল বাঙ্গালির কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করা উচিত। যার ফলশ্রুতি আজকের পশ্চিমবঙ্গ। তা না হলে দেশভাগের সময় গঙ্গার পূর্বপার পর্যন্ত পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতো। আর তথাকথিত নেতা যারা কলকাতায় বসে শ্যামাপ্রসাদকে 'সাম্প্রদায়িক' তকমা লাগিয়ে স্বর্গসুখ অনুভব করেন, তাদেরও আজ বাংলাদেশে বসে থাকতে হতো! শ্যামাপ্রসাদ দেখালেন অখণ্ড বঙ্গে মোটেই মুসলমান প্রাধান্য নেই। সুতরাং দেশভাগের সময় পাকিস্তান গঠনের দাবির ক্ষেত্রে পুরো বঙ্গ কখনই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। পদ্মার পশ্চিমভাগ যা হিন্দুপ্রধান তা অন্তর্ভুক্ত হবে ভারতের। সেদিন শ্যামাপ্রসাদ অত্যন্ত সফলভাবে আইনসভার হিন্দু সদস্যদের তাঁর এই প্রাসঙ্গিক দাবি বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলশ্রুতি ২০শে জুন ১৯৪৭, সিদ্ধান্ত গৃহীত হল বঙ্গ দ্বিধা বিভক্ত হবে। হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গ ভারতের আর মুসলিম প্রধান পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদের উদ্যোগেই সেদিন পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হয়েছিল। তাই 'পশ্চিমবঙ্গ' এই নামকরণেরও একটি ইতিহাস রয়েছে, যাকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে শ্যামাপ্রসাদের উজ্জ্বল ইতিহাসকে অবমাননার শামিল।

যারা সেদিন দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে অতিদ্রুত ক্ষমতা দখলের জন্য দেশকে টুকরো করেছিল, তারাই হঠাৎ করে হয়ে উঠলেন পরম শ্রদ্ধেয়, দেশপ্রেমিক, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় নেতা। আর তৎকালীন বাঙ্গের কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্‌ব্লিতে হিন্দু সদস্যদেরকে বুঝিয়ে ড. মুখার্জি রাজি করাতে সক্ষম হয়েছিলেন বঙ্গ ভাগের পক্ষে। কারণ দূরদর্শী শ্যামাপ্রসাদ বুঝেছিলেন অখণ্ড বঙ্গ পাকিস্তানে গেলে হিন্দুদের নিরাপত্তা সম্পূর্ণরূপে বিপন্ন হবে। তাই তিনি হয়ে উঠলেন 'সাম্প্রদায়িক!' যেহেতু তিনি হিন্দু নিরাপত্তার কথা সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন এবং 'Complete population exchange' অর্থাৎ ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হওয়া দেশে পূর্ণরূপে ধর্মের ভিত্তিতে জনবিনিময়ের দাবি তুলেছিলেন (যদিও তা গৃহীত হয়নি), তাই তাঁর সৃষ্টি করা হিন্দুদের বাসযোগ্য ভূমি পশ্চিমবঙ্গে কিছু হিন্দু নেতার কাছেও হয়ে উঠেছিলেন 'সাম্প্রদায়িক'। সম্ভবত তাঁর জনপ্রিয়তাই তাঁদের ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছিল। তাঁর বিরাট অপরাধ ছিল নিরাপদে হিন্দুদের বাসযোগ্য ভূমির দাবি করা। ধন্য বিচক্ষণতা! এই প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের সংসদ ভবনে এক বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যখন বঙ্গভাগের জন্য তাঁকে দায়ী করেছিলেন, উত্তরে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন ''আপনারা ভারতবর্ষকে ভাগ করেছেন, আর আমি পাকিস্তানকে ভাগ করেছি।'' মহম্মদ আলি জিন্নারও প্রবল আগ্রহ ছিল কলকাতার উপর। শ্যামাপ্রসাদের উদ্যোগে মুসলিম লিগ কলকাতাকে তো পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে পারলই না, উপরন্তু পঞ্জাব (পূর্ব)ও হাতছাড়া হলো। এই প্রসঙ্গে জিন্না বললেন ''এই পোকায় কাটা পাকিস্তান আমার চাই না।''

শ্যামাপ্রসাদের তাৎক্ষণিক ও বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্তের জন্যই আজ আমরা পশ্চিমবঙ্গে বাস করতে পারছে। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অসংখ্য হিন্দু বাঙ্গালি শরণার্থী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করছেন। কিন্তু দুশ্চিন্তার বিষয় সামান্য রাজনৈতিক স্বার্থে যদি মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটানো হয় তবে ভারসাম্য নষ্ট হবে। আশঙ্কা হয় দেগঙ্গা ধুলাগড়, ক্যানিং বা সদ্য ঘটা সন্দেশখালির মতো ঘটনাগুলি দেখে। এগুলি কীসের ইঙ্গিত বহন করছে। শ্যামাপ্রসাদের মতো পরিত্রাতা কোথায় যিনি নিঃস্বার্থভাবে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করবেন হিন্দু বাঙ্গালিদের রক্ষার্থে। তাই পুনরায় উদ্বাস্তু হলে এই হিন্দুদের আশ্রয়স্থল কী হবে? দুঃশ্চিন্তা হয়। ঘরপোড়া গরুতো তাই সিন্দুরে মেঘ দেখলে ভয় হয়। আজ এত বছর পরেও শ্যামাপ্রসাদের সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। পাশ্ববর্তী দেশে (বাংলাদেশে) তথাকথিত পরধর্ম সহিষ্ণু সরকারের আমলেও হিন্দু নির্যাতন ও সম্পত্তি দখল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদ্বাস্তু হিন্দুরা, শরণার্থী হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে আজ যার জন্য নিশ্চিন্তে বসবাস করছে, দুর্ভাগ্য একবারের জন্যও অধিকাংশই তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে না। উদ্বাস্তু শরণার্থী সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদের বলিষ্ঠ চিন্তা হলো তাদের আশ্রয় দিতে হবে, কারণ ধর্মীয় কারণে তারা বাস্তুভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। কিন্তু মুসলমানরা অনুপ্রবেশকারী। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থে তারা কোনো পররাষ্ট্রে প্রবেশ করে। এদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অবিলম্বে এদের ফেরত পাঠাতে হবে। সুতরাং চিহ্নিতকরণ ও নাগরিক পঞ্জি (NRC) গঠন অত্যন্ত জরুরি। তাই পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিবসের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙ্গালির পরিত্রাতা, ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বিনম্রচিত্তে তাঁর পাদপদ্মে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু বাঙ্গালিরা যতদিন থাকবে শ্যামাপ্রসাদ অক্ষয় ও অমর হবেন। হিন্দু বাঙ্গালি বিশেষত উদ্বাস্তু হিন্দু বাঙ্গালিরা কোনোওদিনই শ্যামাপ্রসাদের স্বর্গীয় ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না।■

অতি চালাকের গলায় দড়ি

বহু বহু বছর আগে কাশীর কাছে উদয়নগর নামে একটি গ্রাম ছিল। সেখানকার লোকেরা খুব সুখে আর আনন্দে দিন কাটাত। সেই গ্রামে মোহন আর সুবোধ নামে দুই বন্ধু থাকত। দুজনেই পড়াশোনা শেষ করে কাজকর্মের চেষ্টা করছিল। একদিন মোহন সুবোধকে বলল বন্ধু পাশের রাজ্যে নাকি



ফসলের অনেক দাম, সেখানে গিয়ে আমরা যদি আমাদের জমির ফসল বিক্রি করি তাহলে অনেক দাম পাওয়া যাবে আর আমাদের ভালো আয়ও হবে। সময়ে অসময়ে হতে একটু টাকাও থাকবে। সুবোধ বলল এতো খুব ভালো কথা। চলো আমরা বাড়িতে কথা বলে পাশের রাজ্যে গিয়ে আমাদের জমির ফসল বিক্রি করে আসি।

বাড়ির বড়োদের সঙ্গে কথা বলে মোহন আর সুবোধ নিজে নিজের ফসল নিয়ে পাশের রাজ্যে গেল। সেখানে খুব ভালো দামে বিক্রিও করল। ফলে তাদের খুব লাভ হলো। কিন্তু বাড়ির জন্য কেনাকাটা করতে করতে খুব দেরি হয়ে গেল। তারা যখন বাড়ির পথ ধরল তখন সন্ধ্যে হয় হয়। কিছু দূর এসে মোহন সুবোধকে বলল আজ আর বাড়ি ফেরা যাবে না। সামনে গভীর জঙ্গল। ডাকাতরা টাকাপয়সা লুটে নিতে পারে। সামনে সরাইখানায় কিছু খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ব আর ভোর হলেই রওনা দেব।

সুবোধ মোহনের কথায় সায় দিল। মোহন বলল কিন্তু ভাই এত টাকাপয়সা নিয়ে সরাইখানায় যাওয়া ঠিক হবে না। এখানে কোনো একটা গাছের গর্তে টাকাপয়সা রেখে যাই। ভোরে যাওয়ার সময় নিয়ে যাব। আসলে মোহনের মনে অন্য মতলব ছিল, সেটা সুবোধ বুঝতে পারল না। তাই মোহনকে বিশ্বাস করে সেই কথাতেই রাজি হয়ে একটা গাছের কোটরে করে টাকাপয়সা রেখে দিল। তারপর সরাইখানায় এসে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল। সারাদিনের খাটুনিতে সুবোধ ঘুমিয়ে পড়ল। মোহন খুব ধূর্ত ও বেইমান। সুবোধ ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে সে সেই গাছের কোটর থেকে সমস্ত টাকাপয়সা নিজের পুঁটলিতে নিয়ে এসে লুকিয়ে রেখে সুবোধের পাশে শুয়ে পড়ল।

পরদিন যথারীতি ভোর ভোর থাকতে দুজনে গাছের কাছে এসে কোটরে দেখল টাকাপয়সা কিছুই নেই। সুবোধ কাঁদতে লাগল। মোহনও মিছি মিছি কাঁদতে লাগল। তারপর একে অন্যকে দোষ দিতে দিতে সর্বস্বান্ত হয়ে গ্রামে ফিরল। মোহন বাড়িতে গিয়ে তার বাবাকে জানাল আসল ঘটনাটা। ছেলে সুবোধের টাকা হাতিয়ে নিয়েছে জেনে খুব খুশি হলো। মোহন সব টাকা তার বাবাকে দিয়ে বলল কোনো গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখ।

অন্যদিকে সুবোধের কাছে সব ঘটনা শুনে তার বাবা ও পরিবারের সবাই খুব ভেঙে পড়ল। মোহনের বাবা কপট দুঃখ প্রকাশ করে বলল সারা বছরের ফসলের টাকা চুরি হলো, এখন আমি কীভাবে সংসার চালাব। সুবোধ তার বাবার কানে কানে বলল বাবা, তুমি গ্রামের মোড়লদের ডাকো। আমি জানি টাকা মোহনই নিয়েছে। তার বাবা বলল প্রমাণ কোথায়? সুবোধ বলল প্রমাণ ঠিক জোগাড় হবে। তুমি সবাইকে ডাকো।

গ্রামের সবাই জড়ো হলো। মোড়লরা বলাবলি করতে লাগল এ কেমন কথা। এত টাকা কোথায় গেল। মোহন হঠাৎ বলে উঠল আমরা যে গাছের কোটরে টাকা রেখেছিলাম সেই গাছের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেই গাছই বলে দেবে টাকা কে নিয়েছে। মোহন পরিকল্পনা মতো ওই গাছের পিছনে তার বাবাকে লুকিয়ে রেখেছিল। মোহনের ইচ্ছা ছিল গাছকে জিজ্ঞাসা করলে গাছের হয়ে তার বাবা সুবোধের নামটা বলে। কিন্তু বার বার তো আর লোক ঠকানো যায় না। ভগবান তো ভালো মানুষের পাশে সবসময়ই থাকেন। সুবোধ কিন্তু মোহনের চালাকি ধরে ফেলল। মোড়লরা যখন গাছের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল টাকা কে নিয়েছে? তখন গাছের আড়াল থেকে মোহনের বাবা দৌড়ে বেরিয়ে এল। কারণ সুবোধ শুকনো লতাপাতা জড়ো করে গাছের গোড়ায় আগেই রেখে দিয়েছিল। ঠিক সময়ে তাতে আগুন লাগিয়ে দিল। এবার মোহনের বাবা চাপে পড়ে সত্যি কথাটা বলে ফেলল। সুবোধ তার অংশের টাকাটা ফেরত পেল। মোড়লরা মোহন আর তার বাবাকে মাথা মুণ্ডন করিয়ে, মুখে চুনকালি মাখিয়ে সারা গ্রাম ঘোরাল। অপমানে ও লজ্জায় মোহনরা পরদিন গ্রাম ছেড়ে চলে গেল।

বৃষ্টি মজুমদার

ভারতের পথে পথে

বাড়মের



রাজস্থানের থর মরুভূমির বুকে রমণীয় মরুদ্যান শহর বাড়মের। ত্রয়োদশ শতকে বাহাররাওয়ের হতে শহরের পত্তন হয়। বাড়মের শব্দের অর্থ পাহাড়ি দুর্গ। দুর্গটি বর্তমানে লুপ্ত। শহরের শেষ প্রান্তে ৪৫০ ধাপ উঁচুতে শ্বেতপাথরের অষ্টভুজা দুর্গ যোগমায়া মন্দির। চারিদিকে ছোটো ছোটো টিলার উপরে ছোটো ছোটো গ্রাম। বাড়িগুলি ঐতিহ্যময় শিল্পকলা-স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও লোককলায় বর্ণময়। শহরের পশ্চিম পাহাড়ের ঢালে রয়েছে সূক্ষ্ম কারুকার্য ও অপরূপ ভাস্কর্যের সমন্বয়ে শ্বেতপাথরে গড়া জৈন মন্দির। শহরের সাতকিলোমিটার দূরে রয়েছে রূপসী বালিয়াড়ি। আটচালা কারুকার্যময় মন্দিরে রয়েছে কাঠের দ্বিভুজ দেবতা বালার্কের মন্দির, শিবজী আখড়া বা শিবমন্দির। বাড়মের শহরের হস্তশিল্প— দারু, কার্পেট, ব্লক প্রিন্টিং, ব্যাগ, কাঁচ বসানো বর্ণময় কাপড়ে এমব্রয়ডারি বিশ্ববিখ্যাত। জানুয়ারি মাসে জুড়ে রাজস্থানের বৃহত্তম গবাদি পশুমেলা বসে বাড়মেরে।

জানো কি?

- সেন্টার ফর সাইন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের সদর দপ্তর নয়া দিল্লি।
- NCERT ছাত্র-ছাত্রীদের ডিজিটাল নিরাপত্তা শেখানোর জন্য গুগল কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করেছে।
- জাপানে বিট কয়েনের মাধ্যমে লেনদেন মান্য।
- ভারতের গোয়াতে প্লাস্টিক সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ।
- সিকিম পূর্ণ জৈব চাষভিত্তিক রাজ্য।
- আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২১ জুন।
- ভারতে সবচেয়ে বেশি সবজি চাষ হয় পশ্চিমবঙ্গে।

ভালো কথা

বৃক্ষরোপণ

জুন মাসের ৫ তারিখে আমাদের গ্রামের ফুটবল মাঠে, রাস্তার ধারে, নদীর পাড়ে, যেখানে একটু ফাঁকা পাওয়া গেছে সেখানেই আমরা নিমগাছ লাগিয়েছি। সবচেয়ে ভালো কথা, পরিমলকাকু বলেছে যারা যে কটি গাছ লাগিয়েছে তাদের সেগুলি সারা বছর দেখাশোনা করতে হবে। খরার সময় জলও দিতে হবে। আমি, বনু,মা,বাবা মিলে বারোটি গাছ লাগিয়েছি। সেদিন খুব আনন্দ হচ্ছিল। মা সবাইকে বলছিল আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস। আর বাবা বলছিল নিমগাছ খুব উপকারী। পরদিন ছবি সমেত খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। স্কুলের বন্ধুরা দেখে বলেছে তারাও ওদের গ্রামে গাছ লাগাবে।

শ্রেয়া মহান্তি, ষষ্ঠ শ্রেণী, গোবিন্দপুর, মানবাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) র বা জা দ	(১) নী নি হি রা ত্তা বা প
(২) শু ন ব শি	(২) ম ন্ত স মা ব গ স

১৭ জুন সংখ্যার উত্তর

(১) মানবসভ্যতা (২) শশাঙ্কশেখর

১৭ জুন সংখ্যার উত্তর

(১) বিলোপসাধন (২) ব্রাহ্মণভোজন

উত্তরদাতার নাম

(১) সৌরভ সরকার, প্রতাপ বাগান, বাঁকুড়া। (২) তুহিন মণ্ডল, বড়জোড়া, বাঁকুড়া। (৩) শিবম সুত্রধর, সরকার পাড়া, পুরুলিয়া। (৪) সুমিতা মণ্ডল, মল্লারপুর, বীরভূম।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

হিমালয় বিজয়ে অকুতোভয় চন্দননগরের পিয়ালি

কৌশিক রায়

বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ হিমালয়ের 'সাগরমাথা' বা 'মাউন্ট এভারেস্ট'-এর উচ্চতম ঔদ্ধত্যকে বিনাশকারী হিসেবে আমরা নেপালের শেরপা তেনজিং নোরগে (নামগিয়াল ওয়াংডি) এবং নিউজিল্যান্ডের স্যার এডমন্ড হিলারির নামই বেশি চিনে এসেছি। তবে এভারেস্ট বিজয়ের পুরুষতান্ত্রিক ইতিবৃত্তে সর্বপ্রথম আঘাত হানেন জাপানের দুঃসাহসী পর্বতারোহিণী জুনকো তাবেই। ভারতের সন্তোষ যাদব ও বচেন্দ্রী পালের মতো দুর্জয় নারীরাও মাউন্ট এভারেস্টের ঔদ্ধত্যকে বশে এনেছেন। তবে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে হুগলীর চন্দননগরের অন্তর্গত কাঁটাপুকুর এলাকার একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েও এভারেস্টের মতো দুলঙ্ঘ্য চূড়া বিজয়ে অনেকটাই সফল হয়েছেন। নাতিদীর্ঘ এই শিখরকন্যাটি হলেন পিয়ালী বসাক। পশ্চিমবঙ্গের আরেক শিখর জয়ী ছন্দা গায়েনের মর্মান্তিক অন্তর্ধান পিয়ালীকে আরো বেশি শিখর অভিযানে উদ্যমী করে তুলেছে।

সম্প্রতি মাউন্ট এভারেস্টের প্রায় ৫০০ মিটারের মধ্যে পৌঁছে গেছিলেন ২৫ বছর বয়সের পিয়ালী বসাক। অক্সিজেন ফুরিয়ে যাওয়ার ফলে এভারেস্ট বিজয় অসম্পূর্ণ রেখেই ফিরে আসেন। তবে, পর্বতারোহণের জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ এবং পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন সেটা অনেক সরকারি-বেসরকারি দরজাতে কড়া নেড়েও পাননি পিয়ালী। যখন তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন তখন তাঁর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বাবা সেরিব্রাল স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে প্রায় অশক্ত হয়ে পড়েন। তবুও ভেঙে পড়েননি পিয়ালীর মা রত্না দেবী। ক্রমশই দূরারোগ্য অ্যালকাহহিমারস রোগে আক্রান্ত হন পিয়ালীর বাবা। ভাইবোনদেরও সংসারের দেখাশোনার অনেকটা দায়িত্ব নিয়েও পর্বতারোহণের দিকে আরও এগিয়ে চলেছেন



পিয়ালী। তেনজিং হিলারির পর্বত অভিযানের কাহিনি পড়েই ষষ্ঠশ্রেণী থেকেই পর্বতারোহণের দিকে আকৃষ্ট হন পিয়ালী। শারীরিকভাবে নিজেকে সক্ষম রাখার জন্য শিখতে শুরু করেন কোরীয় মার্শাল অর্টিতায়কোয়ানডো এবং সাঁতার। দার্জিলিংয়ে মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে পাহাড়ে চড়ার তালিম নেওয়ার সাথে সাথেই গণিতেও স্নাতকস্তরের পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন পিয়ালী।

পিয়ালীর প্রথম পাহাড়ে চড়ার হাতেখড়ি হয় উত্তরাখন্ডে কেদারনাথ-গঙ্গোত্রী-যমুনেত্রী যাত্রা এবং ৪৫০ মিটার উঁচু বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে আরোহণের মধ্য দিয়ে। ২০১০ সালে পিয়ালী ওঠেন হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত ৬৫১৭ মিটার উঁচু মাউন্ট মুলকিলা পর্বতশৃঙ্গে। তবে, অনুন্নত পর্বতারোহণ সরঞ্জাম, খাদ্যের অভাব ও রিসাইকল্ড অক্সিজেন সিলিন্ডারের অপ্রতুলতার জন্য উত্তরাখণ্ডের গাড়ওয়াল অঞ্চলে অবস্থিত ৭৭৫৬ মিটার উঁচু কামেট পর্বতচূড়া অভিযান অসমাপ্ত রাখতে বাধ্য হন তিনি।

নিউদিল্লির ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশনে পর্বতারোহণের অ্যাডভান্সড কোর্স করার পর ৬৫১২ মিটার উঁচু 'ভাগীরথী–২'

অন্য রকম

পর্বতচূড়াতে ওঠার জন্য সর্বমহিলা দলের সদস্যও হন পিয়ালী। তবে, ক্লাউডবার্স্ট বা হড়কা বানের জন্য সেই অভিযান পরিত্যক্ত হয়। খাবার-দাবার, তাঁবু, পর্বতারোহণের সাজ সরঞ্জাম সবই ডুবে যায় বরফের নীচে। চারদিন উত্তরাখন্ডে আটকে থাকতে হয় তাঁদের। আর সেই ব্যর্থতাই, পর্বতারোহণের জেদকে আরো বাড়িয়ে দেয় পিয়ালীর।

নিজে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী না হলে পর্বতারোহণকে জীবনসঙ্গী করে তোলা যে যাবে না সেটা বুঝেছিলেন পিয়ালী। তাই, স্কুল সার্ভিস পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের সহশিক্ষিকা হওয়ার সুযোগ পান তিনি। প্রথম বাঙ্গালি এভারেস্ট বিজয়িনী ছন্দা গায়েনের সাথে আলাপচারিতা পিয়ালীকে নগাধিরাজ হিমালয় অভিযানে আরও বেশি উৎসাহী করে তোলে। আগ্রহের সাথে পাঠ করেন রেইনহোল্ড মেসনার, জন হন্টি, ক্রিস বনিংটন এবং এরিক শিপটনের মতো প্রবাদপ্রতিম পর্বতারোহীদের অভিজ্ঞতাকেও। জখম পা নিয়েও হিমাচাতে বড়া শিগরি হিমাবাহ-র কাছে ৬৫০০ মিটার উঁচু একটি পর্বতশৃঙ্গ এবং ৬০১০ মিটার উঁচু মাউন্ট দিনচেনকাং শৃঙ্গজয় করেছেন পিয়ালী। জরায়ুর টিউমারে শয্যাশায়িনী হলেও পাহাড় বিজয়ের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করেছেন এই বঙ্গললনা। নেপালে শেরপা তেনজিঙ্গের গ্রাম থামে-তে শেরপা মিংমা-র সঙ্গে দেখা হয় পিয়ালীর। মিংমা শেরপার উৎসাহে, অনেক কষ্টে ৬ লক্ষ টাকা এবং কিছু পুরোনো পর্বতারোহণের যন্ত্রপাতি জোগাড় করে, কম খরচে একটি নেপালি ধর্মশালাতে থেকে, প্রবল বরফ ঝড় (ব্লিজার্ড) ও শিলাবৃষ্টিকে উপেক্ষা করে শেরপা পেম্বা থোনডুপের সঙ্গে মানসালু পর্বতাশৃঙ্গে আরোহণ করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন চন্দননগরের পিয়ালী বসাক। বরফের ফাটল বা ক্রেভাসের মধ্যে থেকে নিজেকে একার চেষ্টায় বাঁচিয়েছিলেন পিয়ালী। এই মানসালু শৃঙ্গ জয়ে পিয়ালীর অন্যতম অনুপ্রেরণা ছিল ৮০০০ মিটারের বেশি উচ্চতার ৮টি শৃঙ্গজয়ী, পোল্যান্ডের পর্বত আরোহিণী ওয়ান্দা রুকিউইৎজ। ▮

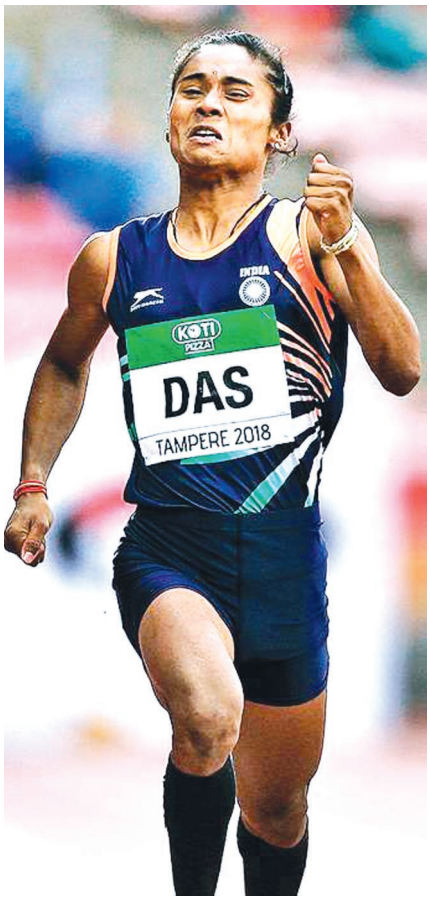
খেলার দুনিয়ার টুকরো কোলাজ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

জোসুয়া আবার লড়তে চান : পূর্বতন বিশ্ব হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ন অ্যান্টনি জোসুয়া মেক্সিকোর অ্যান্ডি রঞ্জির কাছে তার খেতাব হারানোর দুঃখ ভুলতেই পারছেন না। সম্প্রতি নিউইয়র্কের ঐতিহ্যমণ্ডিত বক্সিং সেন্টার ম্যাডিসন স্কোয়ারগার্ডেনে দুই মহাশক্তিশালী বক্সারের মধ্যে খেতাবি লড়াইয়ে হাড্ডাহাড্ডি লড়ে তিনবারের বিশ্বখেতাবধারী জোসুয়া রুইজের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন।

জোসুয়ার প্রমোটার এডিহার্ন জানিয়েছেন খুব সম্ভবত নভেম্বর কিংবা ডিসেম্বরে এই লড়াই হবে। তবে তার জন্য রুইজের প্রমোশনাল টিমকেও সহমত পোষণ করতে হবে। জোসুয়ার ট্রেনার ধর ম্যাকক্রাকের্ন ও ফিটনেস অ্যানালিস্ট স্টিভ এলয়ার্জি এখন থেকেই লড়াইয়ের জমি প্রস্তুতি করছেন। ব্রিটিশ ফাইটার জোসুয়া তিন বছর আগে অপর ব্রিটিশার টাইসন ফিউরির হাত থেকে ওয়ার্ল্ড বক্সিং কাউন্সিল, ওয়ার্ল্ড বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন ও ইন্টারন্যাশনাল বক্সিং ফেডারেশন তিন সংস্থারই বিশ্ব খেতাব কেড়ে নিয়েছিলেন পর পর জিতে। ম্যাডিসন স্কোয়ারে বিশ্বখেতাবী লড়াইয়ে বুকিদের বিচারে ৩২-১-য়ে পিছিয়ে ছিলেন রুইজ। অথচ উত্তর-মধ্য আমেরিকার দেশ মেক্সিকোর প্রথম বক্সার হিসেবে তিনিই কিনা বিশ্ব পর্যায়ে যে কোনো ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে শুধু জোসুয়া কেন, গোটা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। এই পরাজয় কোনো ভাবেই হজম করতে পারছেন না জোসুয়া। তাই বিশ্বসংস্থা অনুমতি দিলেই বছরের শেষে এই দুই ফাইটার আবার নিজেদের মধ্যে তিন হাজার কোটি টাকার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবেন, যে কোনো নিরপেক্ষ কেন্দ্রে।

গ্রহান্তরের নাদাল : কিংবদন্তী জন ম্যাকেনরো নিজের টেনিস খেলোয়াড় জীবনে যেমন বর্ণময় টেনিস খেলে ও বিতর্কিত কার্যকলাপ করে বিশ্ব জনতার মনোযোগ আকর্ষণ করে নিতেন তেমনি ধারাভাষ্যকার হয়েও বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তার মাধ্যমে নিজেকে স্বতন্ত্র প্রমাণিত করে তুলেছেন। সম্প্রতি ফরাসি ওপেনে নিজের ১২ নম্বর গ্রান্ডস্লাম জেতার পর রাফায়েল নাদাল সম্পর্কে জন ম্যাকেনরো মন্তব্য করেন 'গ্রহান্তরের নাদাল'। অস্ট্রেলিয়ার ধর্মযাজিকা মার্গারেটে কোর্ট অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ১১ বার জিতে যে রেকর্ড গড়ে রেখেছিলেন সেই দুর্লঙ্ঘ্য নজির ভেঙে রাফায়েল নাদাল যে উচ্চতায় নিয়ে গেলেন নিজেকে, তা বহু বছর অনতিক্রম্য হয়ে থাকবে। রজার ফেডেরার এই সময়ে দুনিয়ার



অন্যতম সেরা 'আইকন'। এহেন ফেডেরার পর্যন্ত তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কে এতটাই শ্রদ্ধাশীল যে বলেই দিয়েছেন রাফার সঙ্গে খেলার সুযোগ পেয়ে তার জীবন ধন্য।

স্কোয়াশের ফেডেরার ম্যাথু : ভারতের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিময় কিশোর স্কোয়াশ খেলোয়াড় যশ ফাদকে তার আইডল ব্রিটিশ তারকা নিক ম্যাথুকে মনে করেন স্কোয়াশের রজার ফেডেরার। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত ফাদকে বলেছেন ফেডেরারের পর্বত প্রমাণ আত্মবিশ্বাস ও সংকল্পবদ্ধ ফোকাস যেন খুঁজে পাওয়া যায় ম্যাথুর চোখ-মুখে এবং অবশ্যই কোর্টে। তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়াও ইউরোপিয়ান ও কমনওয়েলথ সেরা হয়েছেন একাধিকবার ম্যাথু। ম্যাথুর সঙ্গে ফাদকের বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে ব্রিটিশ ওপেন খেলতে গিয়ে। প্রতিবারই ম্যাথুর কাছ থেকে ইতিবাচক কথা শুনে ফাদকের নিজের ওপর প্রত্যয় বেড়ে গেছে। ম্যাথু তার মধ্যে ভবিষ্যতের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে খুঁজে পেয়েছেন। আর গুরুর খেলার টেকনিক, স্কিপ, ও কিলার ইনস্টিংকটের সঙ্গে মহান ফেডেরারের অনেক মিল দেখতে পান ফাদকে। ম্যাথু ছাড়া ফাদকের অপর 'আইকন' হলেন মিশরের রামি আসিয়র।

প্রথম ডিভিশন পাস করলেন হিমা দাস : 'ধিং' এক্সপ্রেস সব অর্থেই চ্যাম্পিয়ন। অ্যাথলেটিক্স ট্রাকে যেমন বাঘিনীর গতি ও শক্তি নিয়ে ছুটে যান ফিনিশিং টার্গেটের দিকে, তেমনি স্কুলের বোর্ড রুমেও নিজের জাত চিনিয়ে দেন। এবছর অসম বোর্ডের দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় প্রথম ডিভিশন নিয়ে পাশ করেছেন হিমা দাস। হিউম্যানিটিজ শাখায় প্রথম ডিভিশন পাওয়া সত্যিই কৃতিত্বের। আরও বেশি কৃতিত্বের এই কারণে সরাসরি তুরস্কের আন্তর্জাতিক মিট থেকে এসে সরাসরি পরীক্ষায় বসে পড়া সারা বছর বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিট, প্রশিক্ষণ শিবিরে ব্যস্ত থাকতে হয়। তার মধ্যেও পরীক্ষার পড়া ঠিকমতো করে জুনিয়র বিশ্ব সেরা ও এশিয়ার্ড পদকজয়ী হিমার এই রেজাল্ট নারী জাতির কাছে প্রেরণার। ■

তোলাবাজিতে বামেদেরও হারিয়ে দিয়েছে তৃণমূল

ধীরেন দেবনাথ

পশ্চিমবঙ্গে তোলাবাজি সাম্প্রতিককালে এক মারাত্মক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এই ব্যাধির সংক্রমণ শুরু বাম রাজত্বের মাঝামাঝি সময় থেকে। প্রথম দিকে এই ব্যাধি সীমাবদ্ধ ছিল প্রভাবশালী কিছু বাম নেতৃত্বের মধ্যে। তারপর তা ছড়িয়ে পড়ে ছোটো, বড়ো ও মাঝারি নেতাদের মধ্যে। ফলে যাদের ছিল খড়, মাটি, বাঁশ, টালি মায় টিনের ঘর, তাদের পাকাঘর হয়েছে। কারও বা দোতলা, তিনতলা বাড়ি। যারা বিড়ি খেত, তাদের পকেটে উঠেছে দামি সিগারেটের প্যাকেট। যাদের পায়ে ছিল চপ্পল, তাদের চরণ ঢেকেছে দামি জুতোয়। পোশাক-পরিচ্ছদেও এসেছে চাকচিক্য। জীবনযাত্রায়ও এসেছে বাহুল্য। তোলা বা কাটমানি ছাড়া কেউ কোনো কাজই করতে পারছে না। আর সেই তোলাবাজি, কাটমানি বা ঘুষের দৌলতে নেতারা এক একজন হয়েছে 'আঙুল ফুলে কলাগাছ'। অর্থাৎ তাদের বাড়ি হয়েছে, সম্পত্তি হয়েছে, সাইকেলের পরিবর্তে হয়েছে বাইক বা গাড়ি। 'প্রলেতারিয়্যাট্' বা সর্বহারা ও শ্রমজীবী মানুষের পার্টি পরিণত হয়েছে 'বুর্জোয়া' পার্টিতে। 'সর্বহারার একনায়কতন্ত্রে'র ধ্বজাধারীরা হয়েছেন একনায়কতান্ত্রিক, আর গরিব হয়েছে সর্বহারা। সাধারণ মানুষ সব দেখেছে, সব বুঝেছে। তারা ভণ্ড, প্রতারক ও দুর্নীতিবাজ মার্কসবাদীদের সমুচিত শিক্ষা দিতে তৈরি হতে থাকে। বাম জমানার শেষ দিকে বামমার্গীদের কুশাসন, দুর্নীতি, অরাজকতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, রাজনৈতিক হানাহানি ও খুনোখুনি রাজ্যের গণতান্ত্রিক ও সামাজিক পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলে। মানুষ হয়ে ওঠে অতিষ্ট। এমতাবস্থায়, তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন এক গণ আন্দোলনে পরিণত হলে শাসকদল ও সরকার নির্মম দমন-পীড়নের আশ্রয় নেয়। সশস্ত্র সিপিএম হার্মাদ ও পুলিশের গুলিতে হতাহত হয় বহু আন্দোলনকারী। মানুষ খুন করে গুম করা হয় অসংখ্য লাশ। সিঙ্গুরের মাঠে শাসকদলের গুন্ডারা তাপসী মালিককে শারীরিক নিগ্রহ করে তার দেহ জ্বালিয়ে দেয়। এহেন রাজনৈতিক অবক্ষয়ের মধ্যে ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত হয় রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনে জনগণের ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস জয় পায়। বাম-শাসনের অবলুপ্তি ঘটে। কমিউনিস্ট অপশাসনের হাত থেকে বঙ্গবাসী মুক্তি পায়।

মমতার নেতৃত্বে তৃণমূল সরকার গঠিত হওয়ার পর দু'এক বছরের মধ্যেই শাসকদল ও সরকারে ঢুকে পড়ে বামশাসনের 'ভাইরাস'। দলে দলে বাম বিধায়ক, নেতা-কর্মী, সমর্থকরা যোগ দিতে থাকে তৃণমূলে। সরকারি দলের সুবিধা নিয়ে পুরানো ও নব্য তৃণমূলিদের প্রায় সবাই মেতে ওঠে আর্থিক দুর্নীতি বা তোলাবাজিতে। সরকারি প্রকল্পের টাকা নয় ছয় হতে থাকে। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতগুলি হয়ে ওঠে দুর্নীতির আখড়া। শুরু হয় হরিলুট। 'সাথী' ও 'শ্রী'যুক্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প খাতে সরকারের দেওয়া জণগণের প্রাপ্য টাকায় বসে 'কাটমানি' খাওয়া এবং নির্মাণ কাজ, কুটির শিল্প ও যে-কোনো ব্যবসা করতে গেলে তোলা দেওয়া হয়ে ওঠে বাধ্যতামূলক। তোলাবাজিকে 'দিদির ভাইয়েরা' এমন এক করেকম্মে খাওয়ার পর্যায়ে নিয়ে যায় যে সৎকারের জন্য গরিব পরিবারগুলিকে দেওয়া সরকারের ২০০০ টাকায়ও ১০ শতাংশ নিতে থাকে কাটমানি। এর চেয়ে অমানবিকতা ও নির্মমতা আর কী হতে পারে? 'দিদি' এসবই জানেন। আবার বালি, কয়লা ও পাথর খাদানগুলি থেকে পার্টির মদতে শাসক দলের গুন্ডা-মস্তানরা অবৈধভাবে বালি-কয়লা-পাথর তুলে চড়া দামে বিক্রি করছে। অবশ্য উপার্জিত টাকার একটা বড়ো অংশ যাচ্ছে দলের 'রাঘব বোয়াল'দের পকেটে। এ ব্যাপারে অবশ্য তৃণমূলনেত্রী চুপ। তাই বিরোধীরা তৃণমূল সরকারকে 'তোলবাজদের সরকার' বলে তক্‌মা দিয়েছেন।

২০১৪-র লোকসভা ও ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রচণ্ড জালিয়াতি, কারচুপি, রিগিং এবং বহুক্ষেত্রে ভোটকর্তা ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ভুল পথে পরিচালিত ও 'ম্যানেজ' করে এবং শক্তিশালী বিরোধীদল না থাকায় ভোটে জিতেছে। কিন্তু বিগত পৌর ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক সশস্ত্র সন্ত্রাস, খুনোখুনি ও ভোট ডাকাতি করে জয় পেলেও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভোটার ভোট দিতে পারেনি। বিরোধী দলগুলির শতাধিক কর্মী খুন হয়েছে। ফলে অধিকাংশ মানুষ এই সরকারের উপরে হয়েছে ক্ষুব্ধ। পক্ষান্তরে, কেন্দ্রের মোদী সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প দ্বারা রাজ্যের বহু মানুষ উপকৃত হয়েছে। তাছাড়া তৃণমূলনেত্রীর মাত্রাতিরিক্ত মুসলমান তোষণে বিরক্ত জনতার মধ্যে ঘটেছে সাম্প্রদায়িক বিভাজন। আর এসবের প্রতিফলন ঘটেছে ১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে। এ রাজ্যে বিজেপি ১৮টি আসন জিতে তৃণমূলের ঘাড়ে ফেলছে নিঃশ্বাস। আর তাতেই ক্ষমতা হারানোর ভয়ে নেত্রী প্রলাপ বকছেন। আর রাজ্যের চলমান রাজনৈতিক হিংসা, খুন ও সন্ত্রাস বন্ধ না করে, সৎ সাজার জন্য বিরোধীদের মুণ্ডুপাত করে তিনি জেলায় জেলায় গিয়ে নেতাদের জনগণের কাছ থেকে নেওয়া 'কাটমানি' ফেরত দিতে বলছেন ক্ষতিগ্রস্ত জনতাও টাকা ফেরত চাইতে নেতাদের বাড়ি চড়াও হচ্ছেন। আগামীতে সারা রাজ্যে ছড়িয়ে যেতে পারে এই প্রক্রিয়া। টাকা ফেরত না পেলে তারা টাকার দাবিতে ছুটে যেতে পারে কলকাতায়— 'দিদি' বা 'ভাইপো'র কাছে। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। তাই বলতেই হয়, তোলাবাজিতে বামেদেরও হারিয়ে দিয়েছে তৃণমূল। ■



'কাটমানি' ফেরত না পেলে ক্ষতিগ্রস্ত জনতা ছুটে যেতে পারে কলকাতায়— 'দিদি' বা 'ভাইপো'র কাছে। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। তাই বলতেই হয়, তোলাবাজিতে বামেদেরও হারিয়ে দিয়েছে।

ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কিছু অসঙ্গতি

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত একদা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন মুসলমানরা ভারতের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় গোষ্ঠী হতে চলেছে— ভারতের হিন্দুদের বৃদ্ধি ২.১ শতাংশ আর মুসলমানদের ৫.২ শতাংশ, এটা চলতে থাকলে ৫০ বছর বাদে আমরা কী ক'রে হিন্দু রাষ্ট্র থাকব? এটা কি ইসলামিক দেশ হয়ে যাবে না? তিনি এও বলেন হিন্দুদের সংখ্যা বাড়বে না কোন আইনে বলা আছে, বিশেষত যখন অন্যদের সংখ্যা বাড়ছে? এর অর্থ ছিল সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য জনসংখ্যাবৃদ্ধির ব্যাপারে একটা আইন বলবৎ হওয়া উচিত। শ্রী ভাগবতের বক্তব্যের ইঙ্গিত ছিল মুসলমানরা খুব বেশি হারে সন্তান উৎপাদন করছে তাতে ভারতের হিন্দুদের গরিষ্ঠতার ভিত নড়ে যাবে। মনে রাখতে হবে, ভারত হিন্দুদের একমাত্র স্বদেশ (অন্তত দেশবিভাজনের পর তাই দাঁড়িয়েছে)। হিন্দুদের আরও বেশি সংখ্যায় শিশুর জন্ম দেওয়া উচিত। যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে মুসলমানদের জন্মনিয়ন্ত্রণ অবশ্যই করতে হবে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে হিন্দুরা ভারতের জনসংখ্যার ৭৯.৮ শতাংশ ছিল আর ২০০১ সালে ছিল ৮০.৪৬ শতাংশ, অপরদিকে মুসলমানদের ছিল যথাক্রমে ১৪.২৩ ও ১৩.৪৩ শতাংশ। হিন্দু জনসংখ্যা বেড়েছে ১.৫৫ শতাংশ হারে আর মুসলমান জনসংখ্যা বেড়েছে ২.২ হারে। স্পষ্টত মুসলমানরা দ্রুততর হারে সংখ্যায় বেড়েছে। শুধু ওই দশ বছর পর্ব নয় তার পূর্বের দশকগুলির দিকে নজর দেওয়া যাক। *(সারণী-১ দ্রষ্টব্য)*

১৯৫১ থেকে ২০১১ এই ষাট বছরে হিন্দুর সংখ্যা ৮৪.১ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে ৭৯.৮০ শতাংশে; সেখানে ওই একই কাল পর্বে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েছে ৯.৮ শতাংশ থেকে ১৪.২৩ শতাংশ অর্থাৎ আপেক্ষিক ভাবে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানদের তুলনায় ৯ শতাংশ কমেছে। স্মরণীয় যে পাকিস্তান আদায়ের পরে হিন্দুর সংখ্যা বাড়া উচিত ছিল, কারণ বহু হিন্দুর ভারতে ঢোকার আর মুসলমানদের পাকিস্তানে যাওয়ার কথা। কংগ্রেসের জাতীয় সংবাদমাধ্যমের প্যানেলভুক্ত সলমন আনীস সোজ বলেছেন মুসলমানদের বৃদ্ধির হার হিন্দুদের তুলনায় বেশি হারে কমে যাচ্ছে। ১৯৯১ থেকে ২০০১-এর মধ্যে হিন্দুদের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল ১.৮ শতাংশ আর মুসলমানদের জন্য ছিল ২.৬ শতাংশ। ২০০১-২০১১-র মধ্যে হিন্দুদের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল ১.৫৫ আর মুসলমানদের ২.২ শতাংশ। মুসলমান বৃদ্ধি হারের এই আপেক্ষিক কমে আসা স্বাভাবিক ডেমোগ্রাফিক রূপান্তরের অংশ। এর বিভিন্ন



সারণী-১

ধর্মীয় গোষ্ঠী	জনসংখ্যা ১৯৫১ (%)	জনসংখ্যা ১৯৬১ (%)	জনসংখ্যা ১৯৭১ (%)	জনসংখ্যা ১৯৮১ (%)	জনসংখ্যা ১৯৯১ (%)	জনসংখ্যা ২০০১ (%)	জনসংখ্যা ২০১১ (%)
হিন্দু	৮৪.১	৮৩.৪৫	৮২.৭৩	৮২.৩	১১.৭৩	৮০.৪৬	৭৯.৮
ইসলাম	৯.৮	১০.৬৯	১১.২১	১১.৭৫	১২.৬১	১৩.৪৩	১৪.২৩
খ্রিস্টান	২.৩	২.৪৪	২.৬০	২.৪৪	২.৩২	২.৩৪	২.৩০
শিখ	১.৭৯	১.৭৯	১.৮৯	১.৯২	১.৯৪	১.৮৭	১.৭২
বৌদ্ধ	০.৭৪	০.৭৪	০.৭০	০.৭০	০.৭৭	০.৭৭	০.৭০
জৈন	০.৪৬	০.৪৬	০.৪৮	০.৪৭	০.৪০	০.৪১	০.৩৭
জরথুস্টবাদী	০.১৩	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৬	প্রাপ্ত নয়
অন্য/ধর্ম নির্দিষ্ট নয়	০.৪৩	০.৪৩	০.৪১	০.৪২	০.৪৪	০.৭২	০.৯০

ফঃ ৬

কারণ আছে। যেমন নারী শিক্ষা। এই বক্তব্য হাস্যকর। আরও হাস্যকর বক্তব্য : জনসংখ্যা প্রবণতার আর একটা নির্দেশক হলো মহিলা পিছু মোট প্রজনন ক্ষমতা (টিএফআর)। মুসলমান মহিলাদের এই টিএফআর ৩.১ আর হিন্দু মহিলাদের ক্ষেত্রে ২.৭ (২০০৫-০৬); ৯২-৯৩-তে এটা ছিল

● পাকিস্তান থেকে সব হিন্দুকে তাড়ানো হয়েছে।

● স্বাধীনতার পর থেকে পাকিস্তানে হিন্দুদের জনসংখ্যার কেন হ্রাস পায়, ভারতে মুসলমানদের শতকরা হার বাড়ে?

● মুসলমান দেশগুলিতে হিন্দুদের সংখ্যা দ্রুত কমে কেন?

সারণী-২

বছর	মোট জন সংখ্যার শতাংশ			
	হিন্দু	মুসলমান	অন্য	মোট
১৯৫১	৮৫.০	৯.৯	৫.১	১০০.০
২০০১	৮০.৫	১৩.৪	৬.১	১০০.০
২০১১	৭৯.৮	১৪.২	৬.০	১০০.০
২০২১	৭৯.১	১৫.১	৫.৮	১০০.০
২০৩১	৭৮.৪	১৬.০	৫.৬	১০০.০
২০৪১	৭৭.৭	১৭.০	৫.০	১০০.০
২০৫১	৭৭.০	১৮.০	৫.০	১০০.০
২০৬১	৭৬.৩	১৯.৩	৪.৪	১০০.০

যথাক্রমে ৪.৪ ও ৩.৩। আমাদের হাতে সোজাসাপ্টা হিসেবে আছে গত ৭০ বছরে মুসলমান জনসংখ্যা প্রায় ১০ শতাংশ (২০১৭ পর্যন্ত আনুমানিক বৃদ্ধি ধরে) আপেক্ষিক বৃদ্ধি পেয়েছে। সোজের দাবি মুসলমানদের আর্থসামাজিক উন্নতি করার দায়িত্ব নিতে হবে হিন্দুদের, তাহলে মুসলমানদের প্রজনন ক্ষমতা কমবে। নিজেদের দোষে জনসংখ্যা বাড়িয়ে আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সন্তান উৎপাদন করে এবং আধুনিক শিক্ষাকে বর্জন করে শুধুমাত্র জনবিন্যাসের তারতম্য ঘটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করে দেশকে ইসলামিকরণ করা বা দার-উল-ইসলামে পরিণত করার মানসে যে এটা করা হচ্ছে তা আরও কিছু তথ্য দিয়ে বোঝানো যায়। আর বর্তমানে হিন্দুদের শিক্ষিতদের মধ্যে আপেক্ষিকভাবে বেশি। বিশেষ করে জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে প্রকৃত ফার্টিলিটি বোঝা যাবে না। কেন পাকিস্তানের হিন্দু জনসংখ্যা ১২-১৮ শতাংশ থেকে ২.৩ শতাংশ কমেছে?

● হিন্দু, শিখ ও খ্রিস্টানদের পাকিস্তানে কেন গণহত্যা/গণ ধর্মান্তর করা হয়েছে?

২০১১-২০৬১-তে ভারতে প্রধান ধর্মগুলির প্রবণতা। *(সারণী-২ দ্রষ্টব্য)*

অর্থাৎ চল্লিশ বছর বাদে মুসলমানরা হিন্দুদের জনসংখ্যার তুলনায় আপেক্ষিকভাবে ২০ শতাংশ বেড়ে যাবে। পিউ ফোরামের সৌজন্যে জানা যাচ্ছে সারা পৃথিবীতে মুসলমান জনসংখ্যা ২৯ কোটি বেড়ে যাবে আগামী দশ বছরে। আই এস আই প্রকাশিত একটি মানচিত্রে দেখানো হয়েছে, '২০৩০ সালের মধ্যে বৃহত্তর

সারণী-৩

সাল	হিন্দু	মুসলমান
১৮৭৪	৫৬%	৪৪%
১৯৩৪	৪৬%	৫৪%
১৯৪৭	৩৫%	৬৫%
১৯৭১	৩২%	৬৮%
২০১১	৮.৫%	৯০%

ইসলামিক পাকিস্তানি প্রজাতন্ত্র তৈরি হবে। সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ আল্লাহ ও তার লোকেদের দ্বারা (তার অর্থ আল্লাহ শুধু তার লোকের জন্য সকলের জন্য নয়) অধিকৃত হবে। ইনসাল্লাহ। আই এস আই।' এই কথা বলে হিন্দুদের উদ্দেশে সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, "ওহে হিন্দুরা! ইসলাম গ্রহণ করো। নতুবা তোমাদের এখানে বেঁচে থাকার কোনো জায়গা থাকবে না। আল্লাহ হু আকবর।"

১৯৪৭ সালে ঘানায় মুসলমানরা ছিল সংখ্যালঘু, এখন ঘানা ইসলামিক স্টেট অব ঘানা রিপাবলিক। বাংলাদেশে হিন্দুর শতকরা হিসাব।

(সারণী-৩ দ্রষ্টব্য) সারণী-৩ থেকে একটা চিত্র পরিষ্কার যে পূর্ববঙ্গে একদা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু কমতে কমতে আজ নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে মুসলমানরা ইতিমধ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেছে। ১৯৮১ থেকে ২০০১-এর মধ্যে যেখানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা স্বাভাবিক ভাবেই ২ কোটি বাড়ার কথা সেখানে কমে গেছে এক কোটি অর্থাৎ তিন কোটি ভারতে অবৈধ/বৈধভাবে প্রবেশ করেছে। এদের মধ্যে এক বিরাট অংশ আছে মুসলমান। পূর্বতন বাম সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে বাংলাদেশি মুসলমানদের (জ্যোতি বসুর পূর্ণ সমর্থনে) মালদা, মুর্শিদাবাদ দুই দিনাজপুর, নদিয়া প্রভৃতি জেলায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল; তাৎক্ষণিক ভিত্তিতে তাদের রেশন কার্ড চালু করা ও ভোটার তালিকায় নাম ঢুকিয়ে তাদের বৈধ নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। এরাই ছিল বামেদের নিশ্চিত ভোটব্যাঙ্ক। ২০০৮ সাল থেকে অন্য একটি রাজনৈতিক দল তাদের অনুকূলে সুকৌশলে বিপরীতমুখী অধিকতর ন্যক্কারজনক মৌলবাদী তোষণের মাধ্যমে এদের ভোটব্যাঙ্কে পরিণত করে রাজত্ব করছে। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে মুসলমানরা সাক্ষরতায় সামান্য পিছিয়ে আছে। কিন্তু কর্মে অংশগ্রহণে তারা অধিকতর পিছিয়ে কারণ তাদের পশ্চাৎমুখী মানসিকতা তাদের সংগঠিত ক্ষেত্রে আসার মুখ্য প্রতিবন্ধকতা।

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ একটি জাতীয় কৃষক সংগঠন

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

রাজস্থানের কোটা শহরে ১৯৭৯ সালের ৪ মার্চ ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। অখিল ভারতীয় এই অরাজনৈতিক কৃষক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা দত্তপন্ত ঠেংড়ি (১০ নভেম্বর, ১৯২০, ১৪ অক্টোবর, ২০০৪)। শ্রী ঠেংড়ি ছিলেন একজন দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ সংগঠক এবং ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ (১৯৫৫) ও স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের (১৯৯১) প্রতিষ্ঠাতা। তাঁরই সুযোগ্য নেতৃত্বে কোটা শহরে কয়েকজন কর্মী সম্মিলিত হলেন। এরা ভারতের নানা অঞ্চল থেকে কিষানদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছিলেন। তাঁদের সমবেত চিন্তা-চেতনা ও আলোচনা-পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতভাবে স্থির হলো দেশব্যাপী একটি জাতীয় কৃষক সংগঠন গড়ে তোলা হবে। তার নাম দেওয়া হলো 'ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ'।

প্রস্তুত সংগঠনের উদ্দেশ্যগুলি এইরকম :—

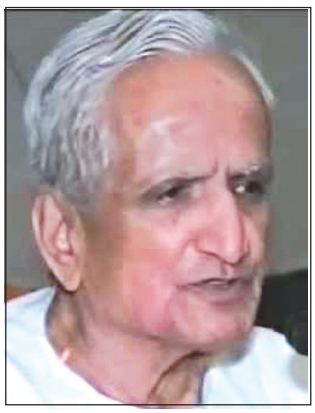
১. আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত অবস্থার উন্নতির জন্য কৃষকদের একত্রিত ও সংগঠিত করা। কৃষি-শিল্পের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করে জীবন-জীবিকার জন্য এবং টিকে থাকার জন্য এক স্থায়ী পথ খুলে দেওয়া।

২. কৃষি প্রযুক্তিতে নতুন প্রবর্তন, উন্নয়ন এবং পদ্ধতিগুলিকে কৃষকদের মধ্যে সম্প্রসারণের জন্য কৃষি-সাহিত্য ও পুস্তিকার জোগান দেওয়া এবং তা গ্রহণ করার জন্য কৃষিজীবী মানুষকে উৎসাহিত করা।

৩. সনাতনী ও পুরাতনী কৃষি কলাকৌশল ও পদ্ধতিগুলিকে গুরুত্ব আরোপ করে তার সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধন ঘটিয়ে পরিবেশ নিরাপত্তার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া যাতে মাটির উর্বরতা, লভ্য জল, বীজ, গবাদি পশু, উদ্ভিদ ও জৈব বৈচিত্র্যে কোনোরূপ সংকট ঘনীভূত না হয়।

৪. শত শত বছর ধরে প্রচলিত দেশীয় পুরাতন কৃষি পদ্ধতিগুলি সংগ্রহ, পরীক্ষণ, উদ্ভাবন, উন্নতিকরণ ও বহুল প্রচলনের মাধ্যমে তার সুফল গ্রহণ এবং তা যাতে পেটেন্টকৃত হয়ে কোনো সুবিধাবাদী ব্যক্তি বা সংগঠনের কুক্ষিগত না হয় তার বন্দোবস্ত করা।

৫. কৃষি বিষয়ক অধ্যয়ন-গোষ্ঠী, অধ্যয়ন-ভ্রমণ, প্রদর্শনী, আলোচনা সভা,



মিলনোৎসব, শোভাযাত্রা, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইত্যাদি সংগঠিত করা যাতে কৃষিজীবী মানুষের কৃষিকাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা যায় এবং তা কৃষকের প্রয়োজনে লাগে।

৬. কিষান সঙ্ঘের কাজ ত্বরান্বিত করতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানান প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করে নেওয়া যাদের সদৃশ উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম রয়েছে।

৭. ঘোষিত উদ্দেশ্য সফল করতে নানান শ্রম-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, সমবায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করা।

৮. কৃষি বিষয়ক নানান ক্রিয়াকলাপকে উৎসাহিত করতে বিবিধ ভারতীয় গোবংশ ও অন্যান্য প্রাণীকুলকে সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধ করা।

৯. ভারতীয় কৃষক ও কৃষিশ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও হৃদ্যতা বাড়ানো এবং গ্রামীণ পেশাগত কাজে নিযুক্ত ছুতার, কামার প্রভৃতি লোকগোষ্ঠী যাতে গ্রামে যথোপযুক্ত পরিবেশে তাদের কৃষিমূলক কাজ চালিয়ে যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করা।

১০. উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং কৃষকের স্বার্থে নানান ক্রিয়াকলাপ ও কার্যক্রম গ্রহণ করা।

১১. জমি, জল, শক্তি সম্পদ ও বাস্তুতন্ত্র ব্যবস্থাপনার জন্য নানান সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করে কৃষককে প্রশিক্ষিত করা।

১২. উন্নত সেচ ব্যবস্থাপনার জন্য এবং জলের অপচয় রোধ করতে নানান সাজসরঞ্জাম ও পদ্ধতি উদ্ভাবন, গ্রহণ ও তার সম্প্রসারণ।

সাংগঠনিক নকশা :

ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ একটি নিবন্ধীকৃত সংস্থা। এর সদস্যতা তিন বছরের জন্য বৈধ এবং কার্যকরী সমিতি গ্রামস্তর থেকে শুরু করে জাতীয় স্তর পর্যন্ত তিন বছরের জন্য বলবৎ থাকে।

ভারতীয় কিষান সঙ্ঘে 'কৃষি' শব্দটির পরিধি বেশ বৃহৎ। তাতে ভৌম কৃষি বা মাঠের ফসল, গো-পালন, উদ্যান পালন, রেশম চাষ, মৎস্যচাষ, বনসৃজন, জৈব কৃষি পণ্যের উৎপাদন, নির্মাণ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবসা ও বাণিজ্যও তাতে সংযুক্ত। এই সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যক্তি এবং কৃষি শ্রমিক তা যে কোনো বর্ণ, ধর্ম, ভাষাগোষ্ঠী, অঞ্চলেরই হোক না কেন, ভারত কিষান সঙ্ঘের সদস্য পদ পেতে পারেন।

গ্রাম সমিতি, উন্নয়ন, ব্লক, জেলা, বিভাগ, প্রান্ত রাজ্য, কেন্দ্রীয় এবং জাতীয় কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় একেবারেই ঘরোয়া পরিবেশে এবং মতৈক্যের ভিত্তিতে। এই কমিটিগুলি বছরব্যাপী নানান ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যেমন সদস্যতা সংগ্রহ, কমিটি গঠন মাসিক বৈঠক, উজ্জীবিত শিবির পরিচালনা, প্রশিক্ষণ শিবির, সভা, গ্রামীণ জমায়েত, সম্মেলন, ভ্রমণ, গ্রামীণ মেলা, পশুমেলা, কৃষক দিবস, প্রতিষ্ঠা দিবস, আদর্শ গ্রাম কল্পনা, সামূহিক ভোজন, বনযাত্রা, গো-পূজন, ভারতমাতা পূজন, পশু প্রতিযোগিতা ফল-সবজি এবং পুষ্প প্রতিযোগিতা, ধরনা, ঘেরাও, প্রদর্শন ইত্যাদির আয়োজন। ■

খড়্গপুরে জলপথ প্রযুক্তিকেন্দ্র গড়ে তুলতে চায় কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আইআইটি খড়্গপুরে অন্তঃর্দেশীয় এবং উপকূলীয় জলপথ প্রযুক্তি কেন্দ্র গড়ে তুলতে আইআইটি-র সঙ্গে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করেছে জাহাজমন্ত্রক। 'মেক ইন ইন্ডিয়া'কে তুলে ধরতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সাগরমালা প্রকল্পের অধীনে স্থাপিত হতে যাওয়া অত্যাধুনিক এই কেন্দ্রটি সম্পর্কে জানাতে গিয়ে শ্রী মান্ডভিয়া বলেন, এই প্রকল্পটি



জাহাজ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং সার ও রসায়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়ার উপস্থিতিতে এই সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

এই অনুষ্ঠানে শ্রী মান্ডভিয়া বলেন, জাহাজ পরিবহণ ক্ষেত্রে দেশজ প্রযুক্তি সময়ের দাবি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাবনা অনুযায়ী দেশের বন্দর এবং জলপথ ক্ষেত্রের জন্য রণকৌশলগত দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার অধীন। এবং এর ফলে অন্তঃর্দেশীয় জলপথ পরিবহণ এবং উপকূলীয় জাহাজ চলাচলে অত্যন্ত সুবিধা হবে। তিনি আরও জানান, ''এই প্রথম এমন একটি কেন্দ্র গড়া হচ্ছে যেখানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবস্থা থাকবে জলপথ ক্ষেত্রের জন্য, যাতে বিদেশি সংস্থাগুলির ওপর নির্ভরশীলতা কমবে ভারতের। গবেষণার খরচ কমবে উল্লেখযোগ্যভাবে। ফলে বন্দর এবং জলপথ পরিবহণের কাজে খরচ ও সময় বাঁচবে।''

শ্রী মান্ডভিয়া আরও জানান 'বর্তমানে অভ্যন্তরীণ এবং উপকূলীয় জলযানগুলির জন্য দেশে পরীক্ষা এবং যাচাই-এর কোনো সুবিধা নেই। যার জন্য জাহাজ নির্মাতাদের ইউরোপীয় দেশগুলির দ্বারস্থ হতে হয়। তাই অভ্যন্তরীণ এবং উপকূলীয় জলপথ প্রযুক্তির জন্য এই অত্যাধুনিক কেন্দ্রটি (সিআইসিএমটি) গড়ে তোলা হচ্ছে দীর্ঘদিনের প্রয়োজন মেটাতে। অভ্যন্তরীণ জলপথ ও দেশের উপকূলীয় জাহাজ চলাচলে গতি আনতেই এই উদ্যোগ।'

এই উপলক্ষ্যে আইআইটি খড়্গপুর সিআইসিএমটি-র অধিকর্তা বলেন, এই সমঝোতাপত্র চুক্তি এবং এই কেন্দ্রটি গড়ে তোলার মাধ্যমে বিশ্বের আরও মাত্র চারটি দেশে যাদের এই সুবিধা আছে তাদের সমকক্ষ হবে ভারত। সাগরমালা কর্মসূচির অধীনে এই প্রকল্পের খরচ ৬৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা জোগানো হবে। সিআইসিএমটি-কে ৫ বছরের জন্য টাকা দেওয়া হবে। এর থেকে প্রাপ্ত আয় থেকেই এর তত্ত্বাবধানের কাজ চলবে। অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণ জাহাজ নির্মাণ, বন্দর প্রভৃতিতে যুক্ত সংস্থাগুলিকে প্রযুক্তিগত সহায়তা, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধা দেবে আইআইটি খড়্গপুরের এই সিআইসিএমটি। উপকূলীয় অভ্যন্তরীণ জলপথের জন্য জাহাজের নকশার জন্য জোর দেবে কেন্দ্র।

এছাড়া জাহাজ নির্মাণ প্রযুক্তি, কাঠামোগত নকশা, পরিবহণ ব্যবস্থা এবং লজিস্টিকের সুবিধা পাওয়া যাবে এই কেন্দ্রে। সিআইসিএমটি স্থাপনার মাধ্যমে বন্দর এবং জলপথ ক্ষেত্রে সরাসরি দেশজ উদ্ভাবনা এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা মিলবে। এতে সাগরমালা কর্মসূচি রূপায়ণের সার্থকতা পাওয়া যাবে। সরকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিল্পের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে ফলিত গবেষণা কার্যকর হবে বন্দর এবং জলপথ ক্ষেত্রের প্রতিদিনের কাজে।

অবসরপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০১৮-র পয়লা এপ্রিল থেকে অতীত দিনের বিখ্যাত ক্রীড়াবিদদের পেনশনের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) কিরেন রিজিজু সম্প্রতি রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে একথা জানিয়ে বলেছেন, বর্তমানে অলিম্পিক/প্যারা-অলিম্পিক গেমসে পদক প্রাপকদের জন্য মাসে ২০ হাজার টাকা করে পেনশন দেওয়া হয়। অলিম্পিক এবং এশিয়ান গেমসে বিশ্বকাপ ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপে স্বর্ণপদক জয়ীদের জন্য ১৬ হাজার টাকা করে পেনশন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়া অলিম্পিক ও এশিয়ান গেমসে বিভিন্ন ধরনের ইভেন্টের যে বিশ্বকাপ রয়েছে তাতে রৌপ্য এবং ব্রোঞ্চ পদকজয়ীদের জন্য ১৪ হাজার টাকা করে, এশিয়ান, প্যারা-এশিয়ান এবং কমনওয়েল্থ গেমস-এর স্বর্ণ পদক জয়ীদের জন্য ১৪ হাজার টাকা করে এবং রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক জয়ীদের জন্য ১২ হাজার টাকা করে পেনশন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়া অবসরপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদদের জন্য খেলাধুলার কোটায় কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরির ব্যবস্থাও রয়েছে বলে তিনি জানান।

প্রবীণ নাগরিকদের বাড়িতে রেশন সরবরাহের নির্দেশ কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তর প্রবীণ নাগরিক (৬৫ বছরের বেশি), দৈহিকভাবে অসমর্থ ও এ ধরনের অন্যান্য ব্যক্তিদের পক্ষে ন্যায্য মূল্যের দোকানে (রেশন দোকান) যাতায়াতে অসুবিধার বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে তাঁদের প্রাপ্য খাদ্যশস্য বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার



ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যসভায় সম্প্রতি এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানান উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবণ্টন প্রতিমন্ত্রী শ্রী দানভে রাওসাহেব দাদারাও। তিনি আরও জানান, গণবণ্টন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব যৌথভাবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির। ভারতীয় খাদ্য নিগমের বিভিন্ন মজুত ভাণ্ডারে খাদ্যশস্য পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি, খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও তার বরাদ্দের প্রাথমিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের।

গণবণ্টন ব্যবস্থার আওতায় যোগ্য উপভোক্তা বা পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করে তাঁদের রেশন কার্ড দেওয়া-সহ সুবিধাভোগী প্রত্যেকের বিভিন্ন তথ্যের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির বলেও মন্ত্রী জানান।

দেশে জাতীয় ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মণিপুরের ইম্ফলে দেশের একমাত্র জাতীয় ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করা হচ্ছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি স্নাতক পর্যায়ের এবং একটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে। এই পাঠ্যক্রমগুলির জন্য এখনই কোনও প্রশিক্ষকের প্রয়োজন নেই। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) কিরেন রিজিজু সম্প্রতি রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে একথা জানিয়ে বলেন, ভারতের ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ (সাই) চুক্তির ভিত্তিতে জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনগুলির জন্য প্রশিক্ষক নিয়োগ করে থাকে। তিনি জানান, এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও ভূমিকা নেই। ভারতের ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ বর্তমানে নিয়মিত ভিত্তিতে ৮৮২ জন এবং চুক্তির ভিত্তিতে ১২৬ জন প্রশিক্ষককে নিয়োগ করেছে। মন্ত্রী জানান, ভারতীয় প্রশিক্ষকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনগুলিকে সহায়তা করা হচ্ছে। পাতিয়ালায় ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব স্পোর্টস এবং মণিপুরের জাতীয় ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষক তুলে আনার জন্য পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে।

জাতীয় মহাসড়কের নিকটবর্তী হাসপাতালে ট্রমা সেন্টার স্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ স্বাস্থ্য পরিষেবা রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত হলেও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রক জাতীয় মহাসড়ক সংলগ্ন সরকারি হাসপাতালগুলিতে ট্রমা পরিচর্যা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিশেষ কর্মসূচি রূপায়ণ করে থাকে। এই কর্মসূচির আওতায় বিগত তিন বছরে (২০১৬-১৭ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত) জাতীয় মহাসড়ক সংলগ্ন সরকারি হাসপাতালগুলিতে ৪৫টি ট্রমা পরিচর্যা ব্যবস্থা গড়ে তোলার অনুমোদন দেওয়া হয়। লোকসভায় প্রশ্নোত্তরপর্বে এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য দেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী অশ্বিনী কুমার চৌবে।

তিনি জানান, ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত মহাসড়ক সংলগ্ন সরকারি হাসপাতালগুলিতে ট্রমা পরিচর্যা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিশেষ কর্মসূচির আওতায় পশ্চিমবঙ্গে চারটি এ ধরনের পরিচর্যা কেন্দ্র গড়ে তোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এগুলি হলো— ডায়মন্ডহারবার, নদীয়ার রাণাঘাট মহকুমা হাসপাতাল, উত্তর দিনাজপুরে রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতাল এবং মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। রাজ্য এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত আঞ্চলিক মহানির্দেশকের কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এখনও পর্যন্ত ১২টি ট্রমা পরিচর্যা কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক রাজ্য সরকারগুলিকে এ ধরনের পরিচর্যা কেন্দ্র গড়ে তোলার বাকি কাজ দ্রুত শেষ করার অনুরোধ জানিয়েছে। উদ্দেশ্য, আগামী মার্চ মাস নাগাদ এ ধরনের পরিচর্যা কেন্দ্রগুলিকে পুরোদমে চালু করা। শ্রী চৌবে আরও জানান, জাতীয় মহাসড়কের প্রতি ১০০ কিলোমিটার অংশে সরকারি স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো, সরঞ্জাম ও মানবসম্পদের চাহিদা পূরণ করে, সেখানে একটি করে ট্রমা পরিচর্যা ব্যবস্থা গড়ে তোলাই এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য।

কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা নিজেদের ছেলেপুলেদের বিদেশে পাঠিয়ে রাজ্যের স্কুল বন্ধ করাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রাজ্য সভায় জম্মু-কাশ্মীরে রাষ্ট্রপতি শাসনের মেয়াদ আরও ছ'মাস বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিতর্কে অংশ নিয়ে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, 'যারা ভারতকে ধ্বংস করার বা দেশের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত তাদের যথপোযুক্ত উত্তরই দেওয়া হবে।' তিনি বলেন, বাজপেয়ীজীর উল্লেখিত 'জামুরিয়ত, ইনসানিয়ত, কাশ্মিরীয়ত'-এর অর্থ যারা সরকারের দুর্বলতা বলে মনে করছে তাদের নিজেদের ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হবে।'

এই সূত্রে শ্রী শাহ চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়ে জানান যারা কাশ্মীরে ভারত ভাঙার চক্রান্ত করে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে বাস্তবে তাদের নিজেদের ছেলে মেয়েরা বিদেশে পড়াশোনা করেছে বা এখনও করছে। তিনি সংখ্যা উদ্ধৃত করে বলেন ১৩০ জন এমন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাকে তিনি জানেন যারা সন্ত্রাসীদের মদত দিয়ে উপত্যকার স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য বিদ্যায়াতানগুলি বন্ধ করার কাজে মদত দিচ্ছেন। অথচ এঁরা নিজেদের সন্তানদের ওপর অশান্তির আঁচ লাগতে না দিয়ে তাদের বিদেশের মহার্ঘ শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এই নেতারা কাশ্মীরি তরুণ তরুণীদের সর্বদা পাথর ছুঁড়ে ভারতীয় সেনাদের আক্রমণে ইন্ধন জোগান। শাহ বলেন, দেশের সরকার এখন আর এদের ছাড়বে না। উপত্যকার সমস্ত স্কুল কলেজ খুলে রাখার চেষ্টা সরকার সর্বতোভাবে করছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির শাসনের অধীনে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আবেগপ্রবণ শা বলেন 'আমরা কাশ্মীরিদের হৃদয় জয় করব... তারাও আমাদের আলিঙ্গন করতে দ্বিধা করবে না।'



তবে সংসদে তাঁর ভাষণে জম্মু-কাশ্মীরের এই দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বৃদ্ধির মূল কারণ হিসেবে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর ভ্রান্ত নীতিকেই তিনি দায়ী করেন। ইতিহাস যে এই মহাভুলকে কোনোদিনই ক্ষমা করবে না সে কথা জানাতেও তিনি দ্বিধা করেননি।

রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছুঁতে মাত্র ছ'টি আসন দূরে এনডিএ জোট

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি এক ধাক্কায় ৪ জন তেলেগু দেশম ও ১ জন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদলের রাজ্যসভা সাংসদ বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। আগামী ৫ জুলাই অনুষ্ঠিতব্য রাজ্যসভার খালি আসনের নির্বাচনে বিজেপির ঝুলিতে আরও চার সাংসদের বৃদ্ধি নিশ্চিত। এই ভাবে ক্রমশই রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের দিকে নিশ্চিতভাবে এগিয়ে চলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এই গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে বিগত এনডিএ সরকারের বহু সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনকারী বিল বিরোধীরা আটকে দিয়েছে। বর্তমানে রাজ্যসভায় এনডিএ-র সদস্য সংখ্যা ১১১ যেখানে মোট সংখ্যা ২৩৫। এর মধ্যে এখন ১০টি আসন ফাঁকা রয়েছে। ৫ জুলাইয়ের নির্বাচনে এনডিএ-র সংখ্যা ৪টি আসন বেড়ে ১১৫-তে দাঁড়াবে। বর্তমানে মোট আসন সংখ্যা ২৪১ ধরলে এর অর্ধেক ১২১ থেকে যা মাত্র ৬টি কম। রাজ্যসভার পরিপূর্ণ সংখ্যা ২৪৫ এতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার মাপকাঠি ১২৩। সেই হিসেবে এনডিএ ৮টি কম থাকবে। কিন্তু চলতি অধিবেশনে বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী বিভিন্ন বিলপাশ করতে এনডিএ-র অসুবিধে হবে না। তেলেঙ্গানার টিআরএস, অন্ধ্রের জগন রেড্ডীর ওয়াই এস আর সি পি বা ওড়িশার বিজেডি-র সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

এই সূত্রে বিজেপির সংসদীয় কাজকর্মের পরিচালকরা জানাচ্ছেন যে এখন বিরোধীপক্ষের কাছে বিলে কোনো সংশোধনী আনা আদৌ সম্ভব নয়। তিন তালাক বন্ধ করার মতো বিতর্কিত বিলের অনুমোদন করানো এখন বিজেপির কাছে বড়ো চ্যালেঞ্জ। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এনডিএ শরিক জনতা দল (ইউ) বা জগন রেড্ডীর অসন্তোষ সত্ত্বেও দল মনে করছে এগুলি আপোশে সমাধান করা যেতে পারে। নিদেন পক্ষে বিলে ভোটাভুটির সময় অনুপস্থিতি সংখ্যার নিরিখে নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়ে বিলগুলির রাস্তা পরিষ্কার করে দেবে।

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বিভাগ সঙ্ঘচালক জয়ন্ত রায়চৌধুরীর মাতৃদেবী প্রভাবতী দেবা গত ১০ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। এলাকার স্বয়ংসেবকদের কাছে তিনি ছিলেন মাতৃসমা। উল্লেখ্য, তাঁর অন্য পুত্র অমিত রায়চৌধুরী সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ শিক্ষিত প্রবীণ স্বয়ংসেবক।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পশ্চিম কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা নগরের স্বয়ংসেবক দেবব্রত বর্মন (চন্দন)-এর পিতৃদেব কার্তিক চন্দ্র বর্মন গত ৪জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি ৪ পুত্র, পাঁচ কন্যা ও নতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ খণ্ডের ফরিদপুর শাখার স্বয়ংসেবক তথা মালদা জেলার গাজোল মহকুমা প্রচারক বাদল রায়ের পিতৃদেব শচীন্দ্রনাথ রায় গত ১৪ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *



মালদহ নগরের স্বয়ংসেবক তথা মালদা জেলার ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত সৌরেন্দ্র নাথ লাহিড়ীর সহধর্মিণী অপরাজিতা লাহিড়ী গত ৭ মে প্রয়াগরাজে পুত্র তপোব্রত লাহিড়ী (প্রতাপ)-র বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। উল্লেখ্য, মালদহে থাকার সময় শ্রীমতী লাহিড়ী রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি ও সংস্কার ভারতীর বহু দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর কন্যা প্রয়াতা আগমনী লাহিড়ীও রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির বহু দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। কন্যার মৃত্যুর পর শোকে তিনি স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্র প্রচারক প্রদীপ জোশীর পিতৃদেব গুণবন্তরাও জোশী গত ৩১ মে মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি ২ পুত্র ও ২ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

বাঁকুড়া জেলার মণ্ডলকুলি শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক বনবিহারী মণ্ডল গত ৬ জন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি দীর্ঘ ১৯ বছর মণ্ডলকুলি সরস্বতী শিশুমন্দিরের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

* * *

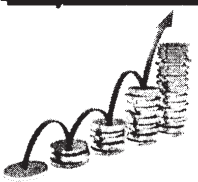
ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী ফুরফুরা অঞ্চলের দাঁড়পুর গ্রামের দিলীপ সিংহরায় গত ২০ মে পরলোকগমন করেন। ১৯৯১ সালে তিনি সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন। দিলীপ একজন সাহসী ও লড়াকু নেতা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকার মানুষ শোকে মর্মাহত।

MUTUAL FUNDS Sahi Hai

হ্যাঁ! আমরাই আপনাকে দিতে পারি
এক উন্নতমানের পরিষেবা
কারণ
আমাদের কাছ থেকে আপনি পাবেন

OUR PRODUCTS	OUR PLANNING
❖ Portfolio Management Services	❖ Retirement Planning
❖ Mutual Fund	❖ Pension Fund
❖ Life Insurance	❖ Children Education Fund
❖ General Insurance	❖ Daughter Marriage Fund
❖ Mediclaim	❖ Estate Creation
❖ Accidental Insurance	❖ Wealth Creation
❖ Company Bond & Fixed Deposit	❖ Tax Planning

মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

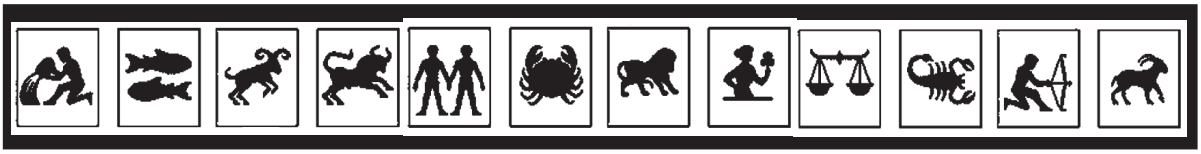


২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা
১৯৯৬ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত
SIP তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন
তাদের প্রত্যেকের ফাণ্ড ভ্যালু বর্তমানে ১ কোটি টাকা
২০ বছরে মোট বিনিয়োগ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মাত্র

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল



৮ জুলাই (সোমবার) থেকে ১৪ জুলাই (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রবি-রাহু-শুক্র, কর্কটে মঙ্গল-বক্রী বুধ, বৃশ্চিকে বক্রী বৃহস্পতি। ধনুতে বক্রী শনি-কেতু। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র কন্যায় উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র থেকে বৃশ্চিকে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে।

মেষ : জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, প্রভাবী ব্যক্তিত্ব, সৃজনশীলতায় উদ্ভাবনী প্রতিভার ব্যাপ্তি ও বিজয়ীর সম্মান। শিল্পী, সাহিত্যিক, কলাকুশলীদের দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে বৈচিত্রায়ন, প্রবাস, বিত্ত ও আভিজাত্য গৌরব। বসন ভূষণ, গৃহ, বাহন, বাক্‌চাতুর্য্যে প্রতিবেশী ও পরিবার পরিজন পরিবৃতে সুখী। সন্তানের বেপরোয়া চাল-চলন, রমণীর প্রতি দুর্বলতা, সময়ের অপচয়।

বৃষ : শারীরিক ও মানসিক অস্থিরতায় পারিবারিক প্রতিকূলতা ও কর্মক্ষেত্রে অসংগতি, উচ্চপদস্থের বিরাগভাজন। চর্ম, পশম, প্লাস্টিক, গবাদি পশু, কৃষিজাত ফসল, নির্মাণ ও ফাস্টফুড হোটেল ব্যবসায় প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে প্রাপ্তির ভাণ্ডার পূর্ণ। অনুজ, পুত্র, কন্যা ও চাকুরিজীবীদের হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে বিত্ত-বৈভব বৃদ্ধি। আচমকা চোট-আঘাত। চক্ষু চিকিৎসার প্রয়োজন।

মিথুন : মন-মানসিকতায় দোদুল্যমানতা, ক্রয়-বিক্রয়, ভ্রমণ, লিখিত চুক্তিতে সাবধানতা আবশ্যক। কর্মক্ষেত্রে অনুমান ক্ষমতা, পারদর্শিতা ও নিষ্ঠায় সাফল্য। অর্থ, বিত্ত ও মিত্রলাভ। গুরুজনের পরামর্শ, সুধীজনের সান্নিধ্যে জীবিকার বিকল্প পথের সন্ধান। খেলাধূলা, সাঁতার, কুস্তিগিরের পেশাগত দক্ষতা, নৈপুণ্যে প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। বিনিয়োগ বৃদ্ধি।

কর্কট : পারিবারিক দায়িত্ব পালনে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে নজর রাখুন।। সামাজিক ও পেশাগত কর্মে দক্ষতা ও সৃজনশীলতা। বহু যোগাযোগ ও বাস্তবায়নে গৌরববৃদ্ধি। পুত্র-কন্যা-সহ কর্মপ্রার্থীদের কর্মসংস্থান ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি। উদার, সহানুভূতিশীলতায় লোক সন্তুষ্টিতে গৃহশ্রীর শংসা প্রাপ্তি। বিদ্যার্থী, গবেষকের সৃজনশীল শক্তির বিকাশ ও প্রতিভার স্বাভাবিক বিচ্ছুরণ।

সিংহ : পারিবারিক অসুস্থতা, কর্মক্ষেত্রে জটিলতায় চলমান সপ্তাহে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ বিঘ্নিত হবে। সম্পত্তি বিষয়ক আইনি জটিলতা ও দুশ্চিন্তার অবসান। বিতর্কিত পরিবেশ ও আবেগপ্রবণতা, পরিবারে অনুশোচনা থেকে মুক্তি। বিদ্যার্থীর মনঃসংযোগের অভাবে শিক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভের বাধা। দুর্জন ও বয়স্ক মিত্র থেকে সতর্ক থাকা দরকার।

কন্যা : কর্মক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও সহকর্মীদের ব্যবহারে মানসিক চাপ বৃদ্ধি ও হতাশা। স্বজন সমাবেশে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আনন্দঘন পরিবেশ। সুধীজনের সান্নিধ্যে মানসিক প্রশান্তি। কর্মপ্রার্থীদের আসন্ন সিদ্ধি করায়ত্ত হয়েও অধরা বা বিলম্বিত যোগ। পিতার স্বাস্থ্যজনিত উদ্বেগ। যুক্তিযুক্ত বক্তব্য ও মন্তব্যের মূল্যায়ন হবে না।

তুলা : ব্যয়াধিক্য, বিরোধিতা, সন্তানের চঞ্চল মানসিকতা, পারিবারিক ছন্দ পতনে ধৈর্য, সংযমী ও বস্তুনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। পৈতৃক ব্যবসায় নতুন উদ্যোগ। গৃহ ও বাহন যোগ পরিলক্ষিত হয়। সপ্তাহের শেষভাগে হতাশার মহাসমুদ্র থেকে বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের জোরে বৈষয়িক উন্নতি। বিত্ত ও অভিজাত্য গৌরব এবং সমাজকল্যাণমূলক কর্মে উজ্জীবিত মন।

বৃশ্চিক : স্ত্রীর কৌশলী আচরণ, আলটপকা মন্তব্যে পারিবারিক সুস্থিতি হানি। পরিবহণ, লৌহ, ওষুধ, বস্ত্র ও আমদানি, রপ্তানি ব্যবসায় প্রাপ্তির ভাণ্ডার পূর্ণ। পেশাদারিত্বে দক্ষতা বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শংসা, পদোন্নতি এবং বেকারদের কর্মসংস্থানের সংবাদ প্রাপ্তি। প্রণয়ের পূর্ণতা প্রাপ্তি। সপ্তাহের প্রান্তভাবে আড়ষ্টতা, অবসাদ, ক্লেশ।

ধনু : জ্ঞান, পাণ্ডিত্য বুদ্ধিমত্তা, আদর্শবাদী ব্যক্তিত্বে পরিচিত মহলে সাধুবাদ প্রাপ্তি। দয়ার্দ্রহৃদয়ে সুধীজনে সহানভূতি, সমবেদনায় লোকসন্তুষ্টি ও আধিপত্য বৃদ্ধি। ধর্ম, কর্ম, গীত, উৎসব, সৎসঙ্গে মুখরিত গৃহাঙ্গন, ঐশ্বর্য ও শ্রীবৃদ্ধি। কীট-পতঙ্গ, বিষক্রিয়ায় রোগের ভুল চিকিৎসায় সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।

মকর : ধর্মবেত্তা, শাস্ত্রজ্ঞ, কাব্যকথায় নিপুণ, সতেজ মন- মানসিকতা, যুক্তিনিষ্ঠ, অনুভবী শিল্প ও সৌন্দর্যের উপাসক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অথবা পিতার শুশ্রূষা প্রয়োজন। সপ্তাহের শেষভাগে শারীরিক ক্লেশ, কর্তব্যে অবহেলা, বন্ধন, স্থানান্তর।

কুম্ভ : উচ্চাভিলাষীর ছল-চাতুরি বিষয়ে সতর্ক ও মিতব্যয়ী হওয়া প্রয়োজন। ব্যুৎপত্তি, সাংগঠনিক ক্ষমতা, কায়িক পরিশ্রমে অন্ত্যজ শ্রেণীর সহায়তা লাভ। বিদ্যার্থীর উচ্চশিক্ষার্থে প্রবাস। প্রবাসী নিকটজনের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

মীন : রুচিশীল মনন, শিল্প-সাহিত্য, ভাস্কর্য, সৌন্দর্য সুধা ও রমণীয় সান্নিধ্যলাভ। ভ্রাতা-ভগ্নীর দ্বিচারিতা ও প্রতিবেশীর ইন্ধনে পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হবে। বিভাগীয় ও প্রশাসনিক প্রধান, অধ্যাপক, ডাক্তার, কর্মাশিয়াল ও ইনকামট্যাক্স অফিসারের মেধা ও দক্ষতায় বিত্ত ও অভিজাত্য গৌরব। নিকট তীর্থ দর্শন।

● ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

শ্রী আচার্য্য